ওঁ হংসঃ ষট্ শ্রী [illegible]

ঠাকুর সদানন্দ।

পরম পূজ্যপাদ ষট্ শ্রীমৎ স্বামী ঠাকুর সদানন্দ সরস্বতী
পরমহংসদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

জনৈক ভক্তানুভক্ত কর্তৃক সংগৃহীত।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের "শিল্প ও সাহিত্য"
পুস্তক বিভাগ হইতে
শ্রী শ্যামলাল শর্ম্মা শিল্পবিশারদ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

মূল্য ৷৵৹ বার আনা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল

"শিল্প ও সাহিত্য" পুস্তক বিভাগের বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত গ্রন্থাবলী।

সাধন প্রদীপ (সনাতন সাধন-তত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য ১ম খণ্ড)			৸৹ আনা
গুরুপ্রদীপ	ঐ	২য় খণ্ড	১৷৹ সিকা
জ্ঞানপ্রদীপ (১ম ভাগ)	ঐ	৩য় খণ্ড	১৷৹ সিকা
জ্ঞানপ্রদীপ (২য় ভাগ)	ঐ	৪র্থ খণ্ড	১৷৹ সিকা
কাশীমাহাত্ম্য	...	...	৵৹ আনা
ঠাকুর সদানন্দ ২য় সংস্করণ	...	...	৸৹ আনা
সন্ধ্যা রহস্য	...	...	।৴৹ আনা

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ শর্ম্মা কলাবিদ্যার্ণব প্রণীত গ্রন্থাবলী।

আলোকচিত্রণ (ফটোগ্রাফি শিক্ষা ১ম ভাগ) ৫ম সংস্করণ			॥৹ আনা
ছায়া-বিজ্ঞান (ঐ ২য় ভাগ) ৩য় সংস্করণ			॥৹ আনা
বর্ণচিত্রণ (পেণ্টিং শিক্ষা)	...	...	১৲ টাকা
চিত্র-বিজ্ঞান (পার্সপেকৃটিভ্ ড্রয়িং) ১ম খণ্ড		...	॥৹ আনা
ঐ ঐ	২য় খণ্ড	...	যন্ত্রস্থ
ভারতীয় স্থাপত্য-বিজ্ঞান	...	...	যন্ত্রস্থ
সচিত্র কাশীধাম ২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ	..	...	১৷৹ সিকা
রঞ্জন-তত্ত্ব (Sceince of colouring)		..	যন্ত্রস্থ
মূর্ত্তিশিল্প (মানব, দানব ও দেব পরিমাণাদি বিষয়ক)			ঐ
ঠাকুর মা (স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক) ২য় সংস্করণ		..	॥৹ আনা
অন্নদাজীবনী, শিল্পাচার্য্য স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ বাগচীর জীবন চরিত	...	...	।৵৹ আনা

প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল, ৯২নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

যাঁহাব অপাবসীম অনুকম্পাবলে কালর এই ভীষণ দুর্দ্দিনেও সনাতন
দিব্য সাধন-পদ্ধতি ভারত হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই, যিনি
সাধু-সজ্জন তথা জগতের কল্যাণ-কামনায় সময় সময় সূক্ষ্মশরীরে
সিদ্ধ গুরুমণ্ডলীকে বিবিধ উপদেশ প্রদান কবিয়া অনুগৃহীত
করেন, পবম পূজ্যপাদ ঠাকুব সদানন্দ দেব যাঁহার প্রিয়-
তম শিষ্য, সেই সর্ব্বজনবরেণ্য আদিগুরু শ্রীমদ্ বৃদ্ধ
ব্রহ্মানন্দ দেব ঠাকুরেব শ্রীচবণ-কমলে সংগ্রহ-
কারের এই অতি সামান্য ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি
"ঠাকুর সদানন্দ"
সবিনয়ে সমর্পিত
হইল।

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া,
কলেগতাব্দাঃ ৫০১৮।

কৃপাভিখারী
সেবক।

প্রকাশকের নিবেদন।

প্রায় বৎসরাধিক কাল অতীত হইল "অবসর" নামক মাসিক পত্রিকায়, পরম পূজ্যপাদ ঠাকুর সদানন্দ দেবের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, ঠাকুরের স্নেহাকাঙ্ক্ষী কতিপয় ভক্তের বিশেষ অনুরোধে তাহাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। শ্রদ্ধেয় জীবনী সংগ্রহকার মহাশয় এযাবৎ ঠাকুরের সম্বন্ধে আরও যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এই সংস্করণে তাহাও সংযোজিত হইল। তাঁহার এবং আমাদিগেরও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যদি কোনও পাঠক পূজ্যপাদের রহস্যপূর্ণ পবিত্র জীবনী সম্বন্ধে অধিকতর কিছু অবগত থাকেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা পরম বাধিত হইব ও পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা সাদরে সংযোজন করিতে প্রয়াস পাইব। ইতি—

১১ই বৈশাখ, ১৩২৪ সাল, কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীশ্যামলাল দেবশর্ম্মা।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ ষট্ শ্রীমদ্ ঠাকুর সদানন্দ দেবের এই পবিত্র "জীবনী" ভক্ত সজ্জন মণ্ডলীর অতীব প্রীতিপ্রদ হওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই সমুদায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। প্রায় তিন বৎসর হইতে বহু ভক্তজনের বিশেষ আগ্রহ সত্ত্বেও ইহার পুনর্মুদ্রনের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সাংসারিক নানা দুর্ঘটনায় ইহা সম্পন্ন করিতে পারি নাই। আজ সেই পূজ্যপাদেরই কৃপায় তাঁহারই আশীর্ব্বাদে এতদিনে ইহা পুনরায় মুদ্রিত হইল। আশা করি ভক্ত পাঠকগণ ইহা পাঠে পরিতৃপ্ত হইবেন। ইতি—

২রা, মাঘ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ। কলিকাতা।

প্রকাশক—
শ্রীশ্যামলাল দেবশর্ম্মা।

ঠাকুর সদানন্দ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিশীথে-বিল্বমূলে।

"তুই ত ভারি দুষ্ট ছেলে!"

"কেন আপনার আমি কি করেছি!"

"যে পাতাটায় আমি হাত দিতে যাচ্চি, সেইটাই যে তুই ভেঙ্গে নিচ্চিস্?"

"বাঃ! আপনার যে ঠিক উল্টো কথা দেখ্‌চি, আমিই ত যেটায় হাত দিচ্চি, আপনি সেইটা ভেঙ্গে নিচ্চেন্।"

"আচ্ছা, তুই এ বেল্‌পাতা নিয়ে কি কর্‌বি বল্‌দেখি?" একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জনৈক ব্রাহ্মণ-বালককে উক্তরূপে তিরস্কারের পর এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন জ্যোৎস্না ফিন্ ফিন্ করিতেছিল, চারিদিক নিস্তব্ধ, জনমানবের একটুমাত্রও সাড়াশব্দ কোথাও নাই, কেবল কোন কোনও বৃক্ষের অন্তরাল হইতে এক একটা পাখী মাঝে মাঝে ডাকিয়া সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। পথের ধারে বাগানের গাছের পুঞ্জীকৃত ছায়ার মাঝে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বালকের কথোপকথন শব্দ শুনিয়াই বোধ হয় কোথাও কোথাও শৃগালাদি নিশাচর জীবজন্তু সরিয়া যাইতেছে, শুষ্ক পত্রের সড়্ সড়্ শব্দে

তাহা বেশ জানা যাইতেছে। কোথাও বা বায়ুবেগে গাছের পাতা নড়িতেছে, তাহার ছায়া ভূমিতলে পতিত হইয়া যেন কত ভীতিপ্রদ কল্পিত জীবের নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে; নিশাচর পক্ষীরা নিঃশব্দে বৃক্ষে বৃক্ষে উড়িয়া তাহাদের আহার্য্য সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু বালকের কোনও দিকেই দৃক্‌পাত নাই, সে নিত্য ভোরে উঠিয়া পূজার জন্য যেমন ফুল বিল্বপত্র তুলিতে যায়, আজও সেইরূপ বাহির হইয়াছে। সে এখনও বুঝিতে পারে নাই যে, অনেক রাত্রি থাকিতেই আজ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। পথে কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া একবার মনে মনে ভাবিয়াছিল—বোধ হয় ভোর হইতে এখনও বিলম্ব আছে, কিন্তু তাহার পরই বিল্বমূলে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বিল্বপত্র চয়ন করিতে দেখিয়া নিশ্চিন্তমনে সেও বেলপাতা সংগ্রহ করিতে লাগিল। যদিও বৃদ্ধকে দেখিয়া বালক তখন মনে করিয়াছিল যে, রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, পরন্তু প্রকৃত-পক্ষে তখন তৃতীয় প্রহরও অতীত হয় নাই। জ্যোৎস্না-রাত্রিতে এমন ভ্রম কখন কখন অনেকেরই হয়।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখিতে যেমন রূপবান, তেমনি দিব্যকান্তি-বিশিষ্ট। তাঁহার শ্বেতশ্মশ্রু ও উন্মুক্ত কেশরাশি, তাঁহার কাষায় বস্ত্র, স্কন্ধবিলম্বিত উত্তরীয়, তাঁহার সেই দিব্য জ্যোতিঃপুঞ্জকে আরও যেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে; তাঁহাকে দেখিলে সহসা ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বাস্তবিক এমন তেজঃপূর্ণ সুন্দর মূর্ত্তি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়। বালকটী নিতান্তই বালক; সবেমাত্র দ্বাদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, হাতে ফুলের সাজি, গলায় পৈতার গোছা, পরিধানে একখানি লাল চেলি, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ, দুইটী সোনার মাকড়ি কাণে দুলু

দুল্ করিতেছে, মাথায় কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ-গুচ্ছ হাওয়ায় ফুর্‌ফুর্ করিয়া উড়িতেছে, ব্রহ্মচর্য্যপুষ্ট দেহকান্তি যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বালকটীর যেমন নাক, তেমনি চোক, মুখ দেখিলে বেশ সাহসী ও বুদ্ধিমান্ বলিয়াও বোধ হয়। দেবাদির পূজা-অর্চ্চনায় তাহার যে প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহা এই রাত্রিতে ফুল-বিল্বপত্র তুলিবার অনুষ্ঠানেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। যখন সেই ব্রাহ্মণ তাহাকে তিরস্কারের পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই এই বেল্‌পাতা লইয়া কি কর্‌বি বল্ দেখি?" তখন সে বেশ সাহসের সহিতই বলিল,—"কেন, পূজা করিব।" ব্রাহ্মণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কি পূজা করিতে জানিস্?" এই বার সে যেন কি চিন্তা করিয়া বলিল,—"না, আমি পূজা করিতে জানি না, তবে আমি গায়ত্রী জানি, আমার দাদারা পূজা করেন।" বোধ হয় বালকটী ভাবিয়াছিল যে, যদি ইনি পূজার মন্ত্র জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে ত বলিতে পারিব না; অথবা এরূপভাবে মিথ্যা কথা বলা বালকের নিশ্চয়ই অভ্যাস ছিল না। ব্রাহ্মণ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, গায়ত্রী কি জানিস্ বল দেখি?" বালক বোধ হয় যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই হইল, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন গায়ত্রী-মন্ত্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন যেমন তাহার জানা ছিল তেমনি আবৃত্তি করিল; সে বুদ্ধিমান ও বিলক্ষণ সাহসী হইলেও এমন পরীক্ষা-বিভ্রাটে কোনও দিনই পতিত হয় নাই, সেকারণ তাহার একটু লজ্জাও হইল। বৃদ্ধ বলিলেন,—"গায়ত্রীর উচ্চারণ ত তোর্ ভাল নয়, তা তুই মন্ত্র-তন্ত্র শিখিস্ না কেন?" বালক যেন লজ্জায় অবনতমস্তক হইয়া বলিল,—"এইবার শিখিব।"

বৃদ্ধ তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন,—"তবে এক কাজ কর্, রোজ এমনি সময় একটু রাত্রি থাকিতে এইখানে আসিস্, আমি তোরে সব শিখিয়ে দেব, কিন্তু আমার কথা কারেও বলিস্ নি।" বালক তাহার কথায় স্বীকৃত হইয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহার কাণে কাণে আরও কি বলিয়া দিলেন। বিল্বতল নিস্তব্ধ হইল। বালক ইহার পূর্ব্বে সেই ব্রাহ্মণকে আর কোথাও দেখিয়াছিল কি না, যদিও সে তাহা সম্পূর্ণ স্মরণ করিতে পারিল না তথাপি তিনি নিতান্ত অপরিচিত হইলেও বিনা তর্কে আজ হইতেই তাঁহাকে আপনার গুরু, শিক্ষাদাতা বলিয়া স্থির করিয়া লইল ও অতি শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহার সকল আদেশ পালন করিতে লাগিল। বালক সে রাত্রি আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে নিজ বাড়ীর দিকে চলিল, বৃদ্ধও ভিন্নপথে কোথায় অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহা এখন হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বের কথা, তখন ইংরাজের এত বড় সাধের কলিকাতা-সহর এমন মোহন-শ্রী ধারণ করে নাই। তখন অতিদূর পল্লীগ্রামের অপেক্ষাও কলিকাতার অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। কলের জল, গ্যাসের আলো বা ড্রেণ, তখন কিছুই ছিল

না, বড় বড় নর্দ্দামা পাঁকে ভরা, এঁদো পুকুর, অনেক জায়গায় হোগলা-বনও ছিল; যেমন মোশা তেমনি মাছি, গোলপাতার ও খোলার ঘরই অধিক, পাকা বাড়ী তখন খুব কম ছিল। ট্রাম ত দূরের কথা, তখন এদেশে রেল গাড়ীরও পত্তন হয় নাই। লোকে হাঁটা পথে, নৌকাযোগে বা গো-শকটে দেশদেশান্তরে গমনাগমন করিত। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে "ছ্যাকড়া-গাড়ী" নামে এক বিচিত্র যানের অস্তিত্ব ছিল, এখনও অশীতিপর-বৃদ্ধ পিতামহীর মুখে তাহার বর্ণনা শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা-হউক, সেই সময় কলিকাতার উত্তর প্রান্তে গঙ্গার ধারে "বরাহনগর" একটী অতি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম, তথায় বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ভদ্র গৃহস্থ ও ধনাঢ্য লোকের বসবাস ছিল। নবদ্বীপাদির তুল্য না হইলেও বিদ্যালোচনায় বরাহনগর নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিল না। অধ্যাপক রামপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার এবং পরে তৎপুত্র প্রেমচাঁদ বেদান্তবাগীশের চতুষ্পাঠী তখন দেশপ্রসিদ্ধ ছিল। বহুদেশ হইতে অসংখ্য ব্রাহ্মণকুমার তাঁহাদের চতুষ্পাঠীতে বিবিধ শাস্ত্র অধ্যায়নের জন্য আগমন করিত। বরাহনগরের চতুষ্পাঠী বলিলে, প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চতুষ্পাঠী বুঝাইত। এতদ্ব্যতীত তাঁতিপাড়ার "বুড়াভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চতুষ্পাঠীর" ও বেশ নাম ছিল। তবে পূর্ব্বোক্ত চতুষ্পাঠীর অধিক প্রসিদ্ধির কারণ—তাহার অধ্যাপক মহাশয় বংশ-পরম্পরায় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। পণ্ডিত রামপ্রসাদ বিদ্যালঙ্কার নানা শাস্ত্রে যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি একজন উচ্চশ্রেণীর কথক বলিয়াও তাঁহার সম্মান ছিল। তাঁহার পিতা গৌরীপ্রসাদ তর্কালঙ্কার, তিনিও কথকতা করিতেন, রামপ্রসাদ তাঁহার পিতার নিকট হইতেই কথকতা শিক্ষা করিয়া-

ছিলেন। গৌরীপ্রসাদের পিতা রামমাণিক্য বিদ্যাসাগর যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি উচ্চ অঙ্গের সিদ্ধসাধক বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁতিপাড়ার যে বুড়াভট্টার্য্যের কথা বলা হইয়াছে, সেই শতাধিক বর্ষ-বয়স্ক বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইঁহারই মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। পুঁটিযার মহারাজ ও সে সময়ের অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিতেন ও বৃত্তি প্রদান করিতেন। ইংরাজী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন। এই পণ্ডিত এবং সিদ্ধ-সাধকের বংশের চতুষ্পাঠী যে চির প্রসিদ্ধ থাকিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রেমচাঁদ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মধ্যম সহোদরও সুপণ্ডিত ছিলেন, তবে তিনি অধ্যাপনাদি কোন কার্য্য করিতেন না, অথবা কোনও সাংসারিক কার্য্যেও তিনি মনোযোগ প্রদান করিতেন না, সর্ব্বদা প্রতিবাসী ধনাঢ্য বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আমোদ-প্রমোদে দিন অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীগণ কেহই অধিক দিন জীবন ধারণ করেন নাই, সেই কারণ তাঁহাদের পিতামহী এক সময়ে তারকেশ্বরে যাইয়া বাবার নিকট মানসিক করেন যে, "আমার রামপ্রসাদের এবার যে পুত্র সন্তান হইবে, তাহাকে তোমার "সন্ন্যাস" করিয়া দিব। ঠাকুর, সে যেন চিরজীবী হয়!" বৃদ্ধা কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করিয়া ঠাকুরের চরণামৃত অতি ভক্তি সহকারে পুত্রবধূকে পান করাইয়া দিলেন। যথাসময়ে পুত্রবধূ একটী অতি সুন্দর নবকুমার প্রসব করিলে বৃদ্ধা তাহার নাম রাখিলেন "ঠাকুর দাস"। শিশু ক্রমে অতি যত্নে ও আদরে লালিত-পালিত হইতে লাগিল, ক্রমে

কথা ফুটিল, কিন্তু মুখে সে এক অস্বাভাবিক শব্দ! সকলেই প্রথমে "মা মা" অথবা "বা বা" বলে, কিন্তু এ শিশুর মুখে "প্রথমেই বাহির হইল "বম্ বম্"। আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসী শিশুর মুখে এই "বম্ বম্" শব্দ শুনিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল; সেই বুড়োভট্টাচার্য্য মহাশয়ও ক্রমে এই কথা শুনিলেন—ও এই শিশুকে দেখিতে আসিলেন। শিশুর মুখে সেই বিচিত্র শব্দ শুনিয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইলেন ও "দীর্ঘজীবী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই ভাবে আদরে আদরে শিশু ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিদ্যারম্ভের কাল উপস্থিত হইলে, যথাসময়ে তাহার বিদ্যারম্ভ করান হইল; বালক নিকটস্থ এক পাঠশালায় বর্ণমালা লিখিতে আরম্ভ করিল। এই সময়েই তাহার পিতার লোকান্তর ঘটে, সাধ্বী মাতাও অচিরকাল মধ্যে সেই পথাবলম্বিনী হন। অধ্যাপক বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও তাঁহার মধ্যম সহোদরেরই পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ ঘটিল, বালক ঠাকুরদাস জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের স্নেহে ও পিতামহীর ঐকান্তিক আদর যত্নে তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিল না। এই বয়সে একমাত্র পুত্র ও একমাত্র সুশীলা পুত্রবধূর বিয়োগজনিত ভীষণ শোকাবেগ কেবল মাত্র এই বালক পৌত্রটীর মুখের দিকে চাহিয়াই ভুলিতে লাগিলেন। বালক ক্রমে অষ্টম বর্ষে উপনীত হইল, জ্যেষ্ঠ বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় তাহার যথারীতি উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন করিলেন, সন্ধ্যা-গায়ত্রী প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম করাইতে লাগিলেন, কিন্তু লেখা পড়ায় তাহার কিছুমাত্র মনোযোগ আকর্ষন করিতে পারিলেন না। পিতামহীর অনুরোধে তাহাকে শাসন করা দূরে থাকুক, কেহ একটী কথাও কোন দিন বলিতে পারিত না; সুতরাং খেলা-

ধুলাতেই তাহার দিন কাটিতে লাগিল। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালক দিগের সহিত মিলিয়া এপাড়া ওপাড়া ক্রমে এ গ্রাম সে গ্রাম করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রথম প্রথম এক বেলা হয় ত বাড়ীতেই আসিল না; "কোথায় গেল, কোথায় গেল" বলিয়া চতুষ্পাঠীর ছাত্রবর্গ চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল; পিতামহী নিজেই কাতর ভাবে ছুটাছুটী করিতে লাগিলেন। তাহার পর যখন তাহাকে বাড়ীতে আনা হইল, বেদান্তবাগীশ মহাশয় শাসন করিতে যাইলেন, পিতামহী তাহাতে বাধা দিলেন। তাহার পরিবর্ত্তে কত আদর যত্ন করিয়া তাহাকে স্নান ও আহারাদি করাইয়া দিলেন। সেই কারণ বেদান্তবাগীশ মহাশয় একদিন বলিলেন, "ঠাকুর মা, তুমিইত আদর দিয়ে দিয়ে দেসোর মাথাটা খেলে।" ঠাকুরদাসকে ছেলেবেলায় সকলে দাসু বা দেসো বলিয়া ডাকিতেন। বৃদ্ধা বলিলেন,—"দেখ্ প্রেমচাঁদ, কেবল এর মুখ চেয়েই আমি উন্মাদ হইনি, নতুবা আমার রাম প্রসাদ যে দিন থেকে আমায় ছেড়ে গেছে, আমার ঘরের লক্ষ্মী বৌমা যে দিন চলে গেছে, সেইদিন থেকেই আমাতে আমি নেই, কেবল তোদের এই গুঁড়োটার মুখ দেখে সে সব ভুলে আছি, কি কর্‌বি বল—তোদের একটী মাত্র ছোট ভাই; ও মা বাপের যত্ন কি তা জান্‌লে না; যদি লেখা পড়া এখন নাই শেখে, এখন একটু খেলিয়ে ছুলিয়ে বেড়ায় বেড়াক্। বড় হলে যখন বুঝ্‌তে পারবে, তখন কি আর অমনি থাকবে? ও আমার ঠাকুরের দাস; ওর বুদ্ধি শুদ্ধি ভালই হবে, তখন দেখিস।" এই বলিয়া বৃদ্ধা তাঁহার অশ্রুসিক্ত নয়ন বস্ত্রাঞ্চলে মুছিলেন। পণ্ডিত প্রেমচাঁদ পিতামহীর কথা শুনিয়া আর কোনও কথা বলিলেন না। সেই

অবধি ঠাকুরদাস জ্যেষ্ঠের শাসন হইতে একেবারে অব্যাহতি পাইল। বালক লেখা পড়া না শিখিলেও, সৌভাগ্যক্রমে কোন দুষ্ট প্রবৃত্তি তাহাকে আশ্রয় করে নাই। উপনয়নের পর হইতেই সে নিয়মিত স্নান-সন্ধ্যাদি যথারীতি পালন করিত, ঠাকুরপূজার জন্য নিত্য পুষ্পাদি সংগ্রহ করিত; দেবতা-ব্রাহ্মণে তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল, তবে চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্রদিগের অধ্যাপনা কালে সে কখনই উপস্থিত হইত না, সে পথে সে কোনদিনই পাদচারণা করিত না, সে সময় গ্রাম-গ্রামান্তরে সে ঠাকুর দেবতা দেখিয়া বেড়াইত; গঙ্গার ঘাটে পঞ্চবটীমূলে "সিদ্ধবাবার" নিকট বসিয়া থাকিত, কখনও বা "ভৈরবীমার" নিকট বসিয়া তাঁহার জীবন কাহিনী শুনিত, আবার কখন কখন তাহার সেই দশ বার বৎসর বয়সেই পাড়ার সঙ্গী বালকদিগের সহিত মিলিয়া কালীঘাট, খড়দহ ও অন্যান্য দেবতার মন্দির ও তীর্থাদি দর্শন করিতে চলিয়া যাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখন কলিকাতা ও তৎসমীপবর্ত্তী গ্রামের পথ ঘাট তেমন ভাল ছিল না, রেলগাড়ীও তখন হয় নাই, মোট কথা যাতায়াতের তেমন সুবিধা ছিল না,—বালক সে বিষয়ে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করিয়া পদব্রজেই সকল স্থানে যাতায়াত করিত, কাহারও বাধা আপত্তি সে গ্রাহ্য করিত না। পিতামহী কত বুঝাইতেন, কত প্রলোভন দেখাইতেন, কোনও কথাই তাহার মনে লাগিত না। তবে কোনও স্থানে দুই একদিন অধিক বিলম্ব হইবে, ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে ঠাকুরমাকে সে কথা বলিয়া যাইত ও তাঁহার নিকট হইতে কিছু কিছু খরচপত্রও চাহিয়া লইত। কখনও বা বৃদ্ধা স্নেহবশতঃ তাহার সঙ্গে সে সকল স্থানে গমন করিতেন।

ঠাকুরদাস এখন সবেমাত্র দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে, এই সময়েই পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত বিল্বমূলস্থিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত তাহার পরিচয় হয়। সে নিত্য পিতামহীর নিকটেই শয়ন করিত, প্রত্যহ গভীর নিশায় সে যখন ফুলের সাজি লইয়া বাহির হইত, তখন সকলেই প্রায় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকিত। কেহই জানিতে পারিত না, বালক কোথায় যায় বা কি করে? যখন বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত, তখন কেহ কেহ সবেমাত্র উঠিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের ক্রিয়া আরম্ভ করিতেন। শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা কি বসন্ত নাই, তাহার নিত্যই সমভাব। এখন হইতে তাহার এইমাত্র পরিবর্ত্তন হইল যে, সে আর দুই এক দিনের জন্য কোথায়ও অতিবাহিত করে না। যেখানেই যাক্ বা সমস্ত দিন কেহ তাহাকে দেখিতে না পাইলেও সন্ধ্যার পর সে ঠাকুরমার নিকট উপস্থিত হইবেই। বেদান্তবাগীশ মহাশয় বা তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা 'শিরোমণি মহাশয়' তাহাকে অল্পই দেখিতে পাইতেন, তবে পিতামহীর নিকটেই প্রত্যহ তাহার সংবাদ লইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতেন। ভ্রাতৃজায়ারা পিতৃ-মাতৃহীন কনিষ্ঠ দেবরকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন; তাঁহাদের দুইজনের কেহ কোনও দিন তাহাকে আহার করাইয়া না দিলে সেদিন তাহার আদৌ তৃপ্তি হইত না। এ অভ্যাস তাহার বহু দিন ছিল, বিশেষ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি তাহাকে এতদূর যত্ন করিতেন যে, মাতৃস্নেহ-বঞ্চিত বালক কোনদিন মাতার অভাব অনুভব করিতে পারে নাই। সুতরাং তাহার বাল্য-জীবন মনের আনন্দেই কাটিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

হর্ষ ও বিষাদ।

দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর দিন, সে দিনও আবার চলিয়া যায়, তাহাতেই মাস, ক্রমে বৎসররূপে অতিবাহিত হইয়া যায়; কালের এই চিরন্তন রীতি সমভাবেই প্রচলিত,—আজ যে শিশু, দু'দিন পরে সে বালক বা কিশোর, আবার কাল-প্রবাহে তাহাকে যৌবনের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া দিবে, সময়ে তাহারও পরিবর্ত্তন হইবে, সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। চির-পুরাতন অতি বৃদ্ধকাল নিত্য নবীন বলিয়াই প্রতিভাত হইতেছে, কেহ তাহা চিন্তার মধ্যে ক্ষণমাত্রও স্থায়ী রাখিতে পারে না। সেই গভীর নিশীথে বিল্বমূলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত প্রথম পরিচয় ও কথোপকথনের পর সুদীর্ঘ তিনটী বৎসর বা সহস্রাধিক দিবস কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ততগুলি গভীর নিশাও অতীতের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে;— বালক ঠাকুরদাসও সেই অতীত দিবস ও রজনীগুলির সহযাত্রী হইয়া আজ তাহার জীবনের ষোড়শ-বর্ষে উপনীত হইয়াছে। নীতিশাস্ত্রে জীবন-কালের এই সন্ধিক্ষণ যৌবনের পূর্ব্বাভাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই সময় হইতে পুত্র পিতার নিকটেও মিত্রবৎ আচরণ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য বলিয়া নীতিজ্ঞদিগের স্থির অভিমত শুনিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক, বালক ঠাকুরদাসের জীবন-নাটকে এই তিনটী

বৎসরের মধ্যে একটী অঙ্ক ও কয়েকটী গর্ভাঙ্কের নিয়মিত অভিনয় হইয়া গিয়াছে। নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষে সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য এস্থলে সংক্ষেপে তাহার দুই-একটী উল্লেখ করিতেছি।

পুরাতন চিরদিনই নূতন আনিবার পক্ষপাতী, তাহা হইলে তাহার যেন কর্ত্তব্য সম্পন্ন হয়, নূতনের হস্তে তাহার কার্য্যভার অর্পন করিয়া সে অবসর লইতে পারে, এই চিরাচরিত প্রথা পরিবর্ত্তন করে কাহার সাধ্য? বৃদ্ধ পিতামহী জ্যেষ্ঠ পৌত্র বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন,—"প্রেম-চাঁদ! আমি কবে আছি কবে নাই, আমার ঠাকুরদাসের বৌএর মুখ দেখিয়া যাইতে বড় সাধ, সে তুই মিটাইয়া দে।" প্রথমে বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাহাতে অনেক আপত্তি তুলিয়াছিলেন, পরে পূজনীয়া পিতামহীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি অনন্যোপায় হইয়া ভ্রাতার বিবাহ দিলেন; নূতন বধূ গৃহে আসিল, তাঁহার স্ত্রী বরণ করিয়া কনিষ্ঠা দেবর-যায়াকে ক্রোড়ে লইলেন। বৃদ্ধা আজ আনন্দে বিভোর, কিন্তু সে প্রগাঢ় আনন্দের মধ্যেও অলক্ষ্যে তাহার নেত্রপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল, একবার চীৎকার করিয়া বলিয়াও ফেলিলেন,—"ওরে রামপ্রসাদ আজ যে তোর বড় আদরের ঠাকুরদাসের বৌ এসেছে বাপ্‌রে তুই আজ কোথায় রে, তোর্ বিহনে আর যে আমি,"—বড়বৌ তাড়াতাড়ি কনেবৌকে দিদি-শাশুড়ীর ক্রোড়ে দিয়া বস্ত্রাঞ্চলে তাঁহার নয়ন মুখ মুছাইয়া দিলেন। বৃদ্ধা সজলনয়নে কনেবৌয়ের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে মেজবৌ (শিরোমণি মহাশয়ের গৃহিণী) কনিষ্ঠ দেবরকে ধরিয়া আনিয়া বৃদ্ধার ক্রোড়ে বসাইয়া দিলেন

বৃদ্ধা উভয়কে ক্রোড়ে লইয়া বস্তুতঃই এখন আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

কালস্রোতে বিবাহ উৎসবের সে আনন্দ-কোলাহল ক্রমে মন্দীভূত হইয়া গেল, আবার সংসারের একটানা প্রবাহে দিনরাত্রি কাটিতে লাগিল। বৃদ্ধার সকল সাধ এখন মিটিয়াছে ; এ বৃদ্ধ বয়সে যে যত্ন তাঁহার জীবন ধারন, তাহা ত পূর্ণ হইয়াছে,—তাঁহার ঠাকুরদাসের নূতন সংসারের পত্তন হইয়াছে, আর তাঁহার সংসার-মায়ার প্রয়োজন কি ? তিনি যেন ভগবানের নিকট এখন যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

পৌষমাস গিয়া সবেমাত্র মাঘমাস পড়িয়াছে, এ সময় বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই একটু সুখের সময়, সকল ঘরেই ধান চাল গোলাজাৎ হইয়াছে, বিশেষ কয়েক বৎসর অজন্মার পর এবার ফসল আঠার আনা জন্মিয়াছে—সকলেরই আনন্দ, সকলেরই এবার স্বচ্ছল অবস্থা। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের পিতৃশিষ্য বেহালানিবাসী শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ হালদার মহাশয়ের নূতন জমীদারী হইতে যথেষ্ট মুনফা হইয়াছে; সেই কারণ তাঁহার তীর্থদর্শন করিবার প্রবল ইচ্ছা হওয়ায় গুরুপুত্র বেদান্তবাগীশের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য আজ তিনি গুরুপাটে আসিয়াছেন। প্রবীণ হরগোবিন্দ প্রথমে গুরুমাতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গুরুপুত্রকে যথোচিত অভিবাদন করিলেন ও তাঁহার মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহারা হালদার মহাশয়ের এই সদিচ্ছার অনুমোদন করিলেন ও বৃদ্ধা তাঁহার সহিত যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ভক্ত হরগোবিন্দ তাহা শুনিয়া আরও আনন্দিত হইয়া তখনই যাইবার দিন স্থির করিতে বলিলেন আগামী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন

যাত্রা করিবে স্থির হইয়া গেল। যথাসময়ে বরাহনগরের ঘাট হইতে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া সকলে নৌকাযোগে তীর্থ-যাত্রায় বাহির হইলেন। বৃদ্ধা পিতামহীর সঙ্গে শিরোমণি মহাশয়ও চলিলেন। তাঁহারা নানাস্থানে তীর্থ করিয়া ফিরিবার পথে পুনরায় কাশী-ধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেরই ইচ্ছা, এখানে কিছু-দিন তাঁহারা বাস করিবেন। নিত্য গঙ্গাস্নান, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা বিশালক্ষী ও কালভৈরব প্রভৃতি দর্শনে তাঁহারা আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ কাশীর সে সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত, বর্ত্তমান সময়ের মত কাশী তখন জনাকীর্ণ সহরে পরিণত হয় নাই, প্রকৃতই তপোবন-সদৃশ সিদ্ধ-সাধকগণ-সেবিত পুণ্য-তীর্থ কাশীধাম মর্ত্ত্যে কৈলাসপুরীই বলিতে হইবে। পুণ্যবতী বৃদ্ধা পিতামহী এমন স্থানে আসিয়া জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, নিত্য বিশ্বনাথের চরণে কায়মনোবাক্য তাঁহার অভিলাষ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এক দিবস কি জানি তহার কি মনে হইল, তিনি ভাবিলেন, আর কেন? সময় ত সন্নিকট হইয়াছে! মধ্যম পৌত্র শিরোমণি মহাশয় সঙ্গেই ছিলেন, তাঁহাকে তখই ডাকিয়া বলিলেন,—"ঈশেন, আজ আমার শেষ দিন, সকলকে সত্বর আহারাদি সারিয়া লইতে বল্‌,—আর তুই আমার সঙ্গে চল্‌, একবার বাবা বিশ্ব-নাথকে দর্শন করে আসি। আর কালবিলম্ব না করিয়া বৃদ্ধা পদব্রজে বহির্গত হইয়া পড়িলেন, সঙ্গে শিরোমণি মহাশয় ও হরগোবিন্দ বাবু যাইলেন, প্রথমে গঙ্গাস্নান করিয়া লইলেন, তাহার পর বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাদি সমস্ত দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া চিরপবিত্র মণিকর্ণিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেই

বৃদ্ধাকে যেন সহসা ভিন্নরূপা বলিয়া বোধ হইল, সে শিথিল দেহ লোলমাংস যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া কেমন এক যৌবন-প্রভায় তাঁহার শরীর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, দেহে তখন এক প্রকার দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে, তিনি আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া জপ কাবতে লাগিলেন। অন্যূন এক ঘণ্টাকাল এইভাবে অতীত হইলে তিনি শিরোমণি মহাশয়ের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, "এই স্থানেই আর দুই খানা কুশাসন পাতিয়া দাও, আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, আমি একটু শয়ন করিব।" তাঁহাব ঈদৃশ আচরণ দেখিয়া স্নানার্থী দুই একজন ক্রমে তথায় দাঁড়াইয়া গেল, কেহ কেহ পুষ্পচন্দনাদি সহযোগে তাঁহার চরণ পূজা করিতে লাগিল। ক্রমে সূর্য্যদেব গগনের মধ্যদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে, কোথা হইতে এক সংকীর্ত্তনের দল আসিয়া খোল করতাল সহযোগে উচ্চরোলে সংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। হরগোবিন্দ বাবু ও শিরোমণি মহাশয় তখন সেই পূজ্যপাদ দেবীর চরনতলে উপবিষ্ট হইয়া কেবল অশ্রুধারা দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। সময় পূর্ণ হইল—দেবী সকলের অলক্ষ্যে কোথায় অন্তহিত হইলেন, তাঁহার শূন্য দেহ মন্দিরটী মাত্র পবিত্র মনিকর্ণিকাতটে শেষ কার্য্যের জন্য পড়িয়া রহিল।

যথাসময়ে তাঁহার সৎকার করিয়া সকলে বাসায় ফিরিলেন। অনন্তর কাশীধামেই তাঁহার আদ্যকৃত্য সমাপন করিয়া যখন তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, তখন সকলেই তাঁহার অসাধারণ শেষ-লীলার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় ও সমস্ত পরিবার সাময়িক শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন;

কিন্তু ঠাকুবদাসেব কাতবতা আব বলিবাব নহে। সে ইতি পূর্ব্বে কখনও কল্পনাও কবে নাই যে, তাহাব ঠাকুবমাতা তাহাকে এমন ভাবে ছাড়িয়া যাইবেন। পিতামাতার শোক তাহাকে অনুভব কবিতে হয় নাই, আজ পিতামহী তাহাকে যে ভাবে ত্যাগ কবিয়া চলিয়া যাইলেন, তাহাব বিন্দু-বিসর্গও যদি সে পূর্ব্বে জানিতে পাবিত তাহা হইলে সে কখনই তাহাকে ছাড়িয়া দিত না—পিতামহীব সঙ্গে সেও তীর্থদর্শনে বহির্গত হইত। জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া তাহাকে বিশেষ যত্ন কবিয়া বুঝাইতে লাগিলেন তাহাকে স্নান আহাব কবাইলেন, কিন্তু সে কি বুঝে, সে থাকিয়া থাকিয়া কাতব হইয়া উঠে।

পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুবদাস কোন দিন লেখাপড়া কবিত না, জ্যেষ্ঠ কোন দিন তাহাকে আপনাব সম্মুখে আসিতে দেখে নাই, পিতামহীব অনুবোধে সে কোন দিন তিবস্কৃতও হয় নাই; কিন্তু আজ তাহার এই ভাব দেখিয়া জ্যেষ্ঠেব হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল, তিনি স্বয়ং ঠাকুবদাসকে কত বুঝাইলেন, কত যত্ন কবিলেন। ঠাকুবদাস ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াদিগেব ঐকান্তিক যত্নে পিতামহীব সে ভীষণ শোক যেন ক্রমে ভুলিতে লাগিল, আবাব পূর্ব্বেব ন্যায় নানা স্থানে ঠাকুর দেবতা সাধুসজ্জন দর্শন কবিয়া দিন অতিবাহিত কবিতে লাগিল।

পারিল না, গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল, হাত যোড় করিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত বলিল,—"ঠাকুর রক্ষা কর, আমি ছেলেমানুষ কিছুই জানিনি ঠাকুর, আমার কোন অপরাধ নেবেন না। মা দুর্গা রক্ষা কর মা, আমি যে কিছুই জানিনি মা।"

পঞ্চদশ-বর্ষীয়া রাধারাণী বেশ বুদ্ধিমতী, তাহার কাজ কর্ম্ম ও সকলকে যত্ন আত্তি দেখিয়া তাহার বড় যা' মেজ যা' প্রাণ অপেক্ষাও তাহাকে ভালবাসে। বাড়ীর নূতন বৌ, বিশেষতঃ সে ছেলে মানুষ বলিয়া তাহারা তাহাকে কোন কাজেই হাত দিতে দিবেন না, কিন্তু রাধারাণী তাহা শুনিবার পাত্রী নয়। একদিন বড় যায়েদের বিনয় করিয়া সে বলিল,—"আমি কি আর কাজ কর্‌চি, আপনাদের কাজ দেখে কোন্‌টা কেমন করে কর্‌তে হয়, তাই একটু শিখ্‌চি, আপনারা শিখিয়ে না দিলে কে শিখিয়ে দেবে দিদিমণি?"

"আহা রাধারাণী ত নয়, যেন বৃন্দেরাণী"। এই বলিয়া বড় বৌ আদর করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন।

মেজবৌ বলিলেন,—"ঠিক বলেছ দিদি! রাণীর হাত দুখানিও যেম্‌নি মুখখানিও তেম্‌নি, যেমন নরম তেমনি মিষ্টি।"

রাধারাণীর শ্বশুরবাড়ীও যেমন, বাপের বাড়ীও তেম্‌নি। অপূর্ব্ব সংযোগ। এখানে শ্বশুর শাশুড়ী নাই, সেখানেও মা বাপ নাই। রাধারাণী যখন পাঁচ বৎসরের, তখন তাহার দুঃখিনী মাতা পতিবিহীনা অবস্থায় এই একমাত্র কন্যা রাধারাণীকে তাহার ভ্রাতৃজায়ার হস্তে অর্পণ করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন। রাধারাণী তখন নিতান্ত বালিকা, মাতৃহারা হইয়া মাতুল ও মাতুলানীর নিকটে লালিত-পালিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু একদিনের

তয়েও সে বুঝিতে পারে নাই যে সে পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকা; অপিচ, অনেক গৃহে পিতা মাতার যত্নেও কেহ কেহ এত আদর এত যত্ন পায় কি না সন্দেহ! বিবাহের পর তাহার শশুর-বাড়ীতেও সে সেইরূপ স্নেহ সেইরূপ যত্নই প্রাপ্ত হইল। উভয় মা'-ই তাহাকে যেরূপ ভালবাসেন, ভাসুর দুইটীও সেইরূপ কন্যা-নির্ব্বিশেষে তাহাকে স্নেহ করেন, সুতরাং শশুর বাড়ীতেও তাহার সমান আদর। স্বামী প্রেমেও রাধারাণী কম সৌভাগ্যবতী নহে। তবে এ গভীর নিশায়—এই ভীষণ দুর্য্যোগে তাহার যুবক স্বামী তাহার কোনও বাধা না মানিয়া—কোনও আপত্তি না শুনিয়া কোথায় যাইলেন? সে স্থানের আকর্ষণ কি এতই প্রবল? যদি তাহাই হয়, তবে রাধারাণীর স্বামী-সোহাগ বা প্রণয়সুখ কোথায়? সাধারণের মনে এরূপ প্রশ্ন সহজেই উদিত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণের অপেক্ষা রাধারাণী তাহার স্বামীকে এই বয়সেই যে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে, তাহাতে আর তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। সে বালিকা বা যৌবনোন্মুখী হইলেও প্রবীণার ন্যায় তাহার নিজ অধিকার ও ধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে এবং তাহার স্বামী যুবক হইলেও যে নিতান্ত সাধারণ পুরুষ নহেন, সে বিষয়েও তাহার দৃঢ়রূপ ধারণা হইয়াছে, বিশেষতঃ তাহার স্বামী আজ বলিয়া নহে—নিত্যই এই ভাবে যে স্থানে গমন করেন, তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। সেই কারণেই রাধারাণী ঠাকুরের নাম শুনিয়া অত্যন্ত শঙ্কিতভাবে সেই অপ্রত্যক্ষ দেবতার উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া থাকে। যাহাহউক পাঠক! এখন আর বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, রাধারাণী আমাদেরই ঠাকুরদাস-গৃহিণী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাধারাণী।

শ্রাবণ মাস, অবিশ্রান্ত বর্ষা, ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য; শৃগাল কুকুর প্রভৃতি গৃহস্থের আনাচে-কানাচে একটু শুষ্কস্থান দেখিয়া তথায় কুণ্ডলী পাকাইয়া পড়িয়া আছে; কেবল বৃষ্টির অবিরল-ধারাপাত-শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শুনা যাইতেছে না। মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝড় সেও শোঁ শোঁ গোঁ গোঁ শব্দে আকাশ পাতাল কাঁপাইয়া গাছ-পালা ঘর-বাড়ী যেন উল্টাইয়া ফেলিয়া কোথায় ছুটিতেছে। জানালার ফাঁক দিয়া একটা দমকা বাতাস আসিয়া গৃহের প্রদীপটী সহসা নিবাইয়া দিল, চারিদিকে অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ করিতেছে তখন রাত্রি প্রায় তিন ঘটিকা; পঞ্চদশ-বর্ষীয়া একটী কিশোরী স্বামীর করযুগল ধারণ করিয়া করুণভাবে বলিতেছে,—"এমন সময় কি কেহ ঘরের বাহির হয়? একটু জল ধরুক্, তারপর যাবেন।"

বিংশতিবর্ষ-বয়স্ক নবীন যুবা কিশোরীর স্বামী বলিলেন,— "তুমিও যেমন পাগল, এ জল কি এখন ধর্‌বে! আর জল হচ্চে তা আমার কি? ঠাকুরের কৃপায় আমার গায়ে এক ফোঁটাও জল লাগ্‌বে না।" উদ্দেশে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বধু বলিল,— "ঠাকুরের কৃপা ত আছেই, তবে দুপুর বেলা ওপাড়া থেকে আস্‌বার সময় কাপড়-চোপড় সব ভিজে গেল কেন?"

স্বামী। কাপড়-চোপড় ভিজ্‌তেই পারে, কাপড়-চোপড়

ত আর আমি নই। আমার মাথা কি ভিজেছিল দেখেছিলে ?

স্ত্রী। মাথায় গামছা ছিল, তাই বোধ হয় ততটা ভিজেনি, যাহোক এত জলে এই অন্ধকার রাত্রিতে হঠাৎ বেরুবেন্ না, সাপ খোপ শেয়াল চেয়াল কোথায় কি আছে কে জানে—না, আপনি বেরুবেন্ না।

স্বামী। তোমার কোনও ভয় নেই গো কোনও ভয় নেই, ঠাকুরের কৃপায় আমায় সাপেও কামড়াবেনা বাঘেও মারবেনা, তুমি নিশ্চিন্ত হও, এখন আমি যাই।

স্ত্রী। "আবার ঠাকুরের কথা।" এই বলিয়া জোড় হস্তে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস লইয়া পুনরায় বলিল,—"তবে আপনার যা ভাল হয় করুন্।"

ঠক্ ঠক্ করিয়া চকমকি ঠুকিতে ঠুকিতে স্বামী বলিল,—"হা দেখ দেখি কেমন লক্ষ্মীর মত কথাটী বল্লে, ঠাকুরের কৃপায় আমাদের কি কোনও ভয় আছে ? তবে আর তাঁর দয়া কি ?" কিশোরী স্ত্রী আর কোনও কথা বলিল না। ইতিমধ্যে চকমকির আগুন হইতে গন্ধকের দিয়াশলাই দিয়া প্রদীপটী জ্বালিয়া স্বামী গৃহের বাহির হইয়া যাইলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন— "দরজাটা না হয় বন্ধ করিয়া শোও, কোনও ভয় নেই।"

স্বামী চলিয়া যাইলেন, স্ত্রী কিয়ৎক্ষণ দরজার কপাট ধরিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। এখনও বৃষ্টি সমভাবে হইতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে. তাহাতে উঠানের মাঝে ঝাঁকুনি নারিকেল গাছের মাথাটা পর্য্যন্ত বেশ দেখা গেল, গাছটা যেন ধনুকের মত বাঁকিয়া গিয়াছে, এখনই বুঝি ভাঙ্গিয়া পড়িবে ! যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি "রাধারাণী" আর স্থির থাকিতে

সঙ্গে যেন নূতন ধরণের বলিয়া মনে হইতেছে, গাবে কি এক যেন নূতন ভাব মাখাইয়া দিতেছে। তবে কি ইহারা সকলে মিলিয়া মায়ের শুভাগমন-বার্ত্তা জগতে প্রচার করিতে আসিয়াছে?

হায়! সে অতীত স্মৃতি, সে অতুল আনন্দের ভাব আমরা আজ আর ঠিক অনুভব করিতে পারি না। তখন যে বাড়ীতে মায়ের প্রতিমা-রূপে আবির্ভাব হইত, তথায় ত অতিথি অভ্যাগত দীন দরিদ্র সকলেই অতি সমাদরে পরিগৃহীত ও নানা উপচারে পরিসেবিত হইতই, তাহা ব্যতীত প্রতি গৃহেই অন্নপূর্ণার অনন্ত ভাণ্ডার যেন উন্মুক্ত থাকিত, যে বাড়ীতে যাইবে সেইখানেই সমাদরে অতিথি সৎকার, সকল বাড়ীতেই কি যেন এক মহাযজ্ঞ, নিতান্ত অভাবেও খই মুড়কি জলপান, নারিকেল-লাড়ু তিলের-লাড়ু প্রভৃতি বিতরণে কোনও গৃহস্থই তখন পরাঙ্মুখ ছিল না। আর আজ তাহার পরিবর্ত্তে ঘরের ছেলেদেরই দুই বেলা দুই মুঠা জলপান দিতে পারি না। ভাবিতেও প্রাণ ফাটিয়া যায়, হায়! সে সুখের দিন কোথায় গেল? মাগো সাধকবৎসলে অন্নপূর্ণে! একি আমাদেরই জন্মান্তরের কর্ম্মফল মা? শতবৎসরের মধ্যে একি ভীষণ পরিবর্ত্তন ঘটিল মা!

যাহাহউক, বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতেও ছাত্রবৃন্দ আনন্দে ভরা, যাহারা দূরদেশ হইতে অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছে তাহারা কে কে বাড়ী যাইবে, কেমন করিয়া যাইবে তাহারই জল্পনা-কল্পনা করিতেছে। কেহ কেহ বা কোন কোন স্থান হইতে পূজা-কার্য্যে ব্রতী হইবার আহ্বান-পত্র পাইয়াছে, তাহারা মাতৃ-সেবার জন্য তথায় গমন করিবে। প্রতি বৎসরেই নানা স্থান হইতে বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট নিমন্ত্রণ পত্র আইসে। তিনি ছাত্রদিগের মধ্যে

উপযুক্ত বোধে এক এক জনকে এক এক স্থানে প্রেরণ করেন। এ বৎসর চতুষ্পাঠীতে বয়স্ক ও ক্রিয়াবান্ ছাত্রের সংখ্যা অল্প, অথচ নিমন্ত্রণ অনেক। তিনি স্বয়ং বাবুদের বাড়ীতেই চণ্ডীপাঠ করিবেন, কারণ তাঁহার বাড়ীতেও প্রতি বৎসর মহামায়ার অর্চ্চনা হয়; গ্রামে থাকিয়া উভয় স্থলেই সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করিবার অবসর হয় বলিয়া তিনি এ সময় আর অন্যত্র যাইতে পারেন না। আজ ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছেন, আর আপনমনে কত দুঃখ করিতেছেন;—"একটা ভাইও মানুষ হইল না, আজ এ দুটো মানুষ হইলে আমার ভাবনা কি? পৈত্রিক চতুষ্পাঠী, চিরকাল আমাদের একটা মান-সম্ভ্রম আছে, আজ কি না নিমন্ত্রণ-আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে হইল! এখন কি আর ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়? কি যে করি, ভেবে ঠিক করিতে পারিতেছি না। আর কোথা[illegible] স্বগ্রামের রায়েদের বাড়ী আর [illegible] বাড়ীর জন্য ভাবনা! তাইত, —'জগদীশ' আর 'গদাধরকে' রাখ্লেই হ'ত, তারা এতক্ষণ অনেক দূর বেরিয়ে গেছে।"

বেদান্তবাগীশ মহাশয় এইরূপ আপন মনে কত কি ভাবিতে-ছেন, তাঁহার মধ্যম সহোদর শিরোমণি মহাশয় কোন কাজেই নেই, কেবল আমোদ আহ্লাদেই চিরদিন কাটিয়ে দিচ্ছেন; আজ জ্যেষ্ঠের কথা শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইতেছেন, কিন্তু কোনও দিন কোন কার্য্যেই যোগ দেন নাই, আজ যেন কতকটা লজ্জায় কতকটা অভিমানে বলি বলি করিয়াও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না যে, "দাদা, আমি না হয় কোথাও যাইব।" ছোটটীর ত কথাই নাই, তিনি চিরদিনই আদরের পুতুল,

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চণ্ডীপাঠ।

বর্ষার সে ঘনঘটা তিরোহিত হইয়াছে, মেঘের সে ভীষণ গর্জ্জন বা প্রবল বর্ষণ আজ আর নাই, এখন আকাশ বেশ পরিস্কার, নির্ম্মল শারদ গগনে আবার চন্দ্র হাসিয়াছে, আবার তারার দল দল-বাঁধিয়া তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, প্রকৃতি শরৎ সমাগমে আবার হাস্যময়ী—আনন্দময়ী, সংসারের ইহাই ত বৈচিত্র্য। দুর্দ্দিনে বহু আয়াসেও কাহারও সাক্ষাৎ মিলে না, কিন্তু সুদিন ফিরিয়া আসিলে আর কাহাকেও ডাকিতে হয় না, কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না, তখন সকলে যেন আপনার আপনার পূর্ব্ব অধিকার বজায় রাখিতে ব্যস্ত হয়। সংসারের চিরন্তন নিয়মাবলীর মধ্যে ইহাও অন্যতম! শরতের সঙ্গে সঙ্গে সব ফিরিয়া আসিয়াছে, তাই আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে আনন্দোৎসব! ঘরে ঘরেই দুর্গতিনাশিনী আনন্দময়ী মা আসিবেন, সন্তানের দুঃখ-দৈন্য, শোকতাপ সব আজ দূরে যাইবে, সকলেই জগজ্জননী মহামায়ার চরণতলে তাহাদের পুঞ্জীভূত অভাব অভিযোগগুলি নিবেদন করিয়া ধন্য হইবে! সেই হেতু প্রতি ঘরে তাহার বিবিধ উদ্‌যোগ আয়োজন চলিতেছে, প্রতি চণ্ডীমণ্ডপের প্রয়োজনমত সংস্কার হইতেছে, সকলেই স্ব স্ব অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর। কেবল বাঙ্গালা বলিয়া নহে, সমগ্র ভারত আজ আনন্দে বিভোর, সকল হিন্দুগৃহেই "সপ্তশতী" চণ্ডীর আরাধনা হইবে, নবরাত্রির

উৎসবে যেন আনন্দের নূতন প্রবাহ বহিবে। তাহাতে শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য কাহারই বাধা নাই, মাতৃচরণ দর্শনে—নানা যন্ত্রণা দুঃখের পর মায়ের শান্তিময় পবিত্র নাম স্মরণে কাহারই বা আপত্তি হইবে? তবে মার কোলের ছেলে বাঙ্গালীর আনন্দ বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাই বাঙ্গালা যুড়িয়া তাঁর বিরাট প্রতিমা গড়িতেছে। রাজা-মহারাজ হইতে কুটীরবাসী ভিখারী পর্য্যন্ত তাহাতে সহায়তা করিতেছে, সে পরমানন্দে যোগদান করিতে সকলেই যেন ব্যস্ত ও উন্মত্তপ্রায়। বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকেই আপনার আপনার সামর্থ্যের অনুরূপ নূতন বসন-ভূষণে ভূষিতা হইয়া নূতন আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালী আজ গৃহে আসিবে, অনেক দিনের পর সকলে একত্র হইবে, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিবে। বালকেরা নৃত্য করিতেছে, প্রত্যহ দিন গণিতেছে—কবে পাঠশালার ছুটী হইবে, কবে বাবুদের সাত-ফুকুরে-দালানে মহামায়ার প্রতিমা সুসজ্জিত হইবে, নিত্য তাহা দেখিয়া আসিতেছে। মায়ের পূজা হইবে কত লোকজন আসিবে, ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা কত বাজিয়া উঠিবে, ধূপ ধুনা গুগ্‌গুলের ধূমে আকাশ পাতাল ভরিয়া যাইবে, হোমাগ্নিশিখা লক্ লক্ করিয়া পূর্ণাহুতি গ্রহণ করিবে, পূত মন্ত্রের মৃদুমন্দ গম্ভীর স্বরে চারিদিক মুখরিত হইবে, পবিত্র চণ্ডীপাঠের গভীর নিনাদে হৃদয়ের পরতে পরতে উল্লাসের বিদ্যুল্লহরী ছুটিতে থাকিবে; ওঃ সে কি আমোদ! আজ তাই বুঝি ঐ দেওয়ালে, ঐ গাছ পালার উপর পড়িয়া রৌদ্রটা পর্য্যন্তও তাহাতে আগে হইতে যোগ দিয়াছে, তাহার কেমন যেন নূতন রং কেমন নূতন ভাব, হাওয়াটাও সেই

কোনদিন চণ্ডীমণ্ডপের দিকে পাদচারণাও করেন নাই, লেখা পড়া কাহাকে বলে সে সংবাদ কোন দিনই তাঁহার ছিল না, সুতরাং তাঁহার নিকট বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের কোন আশাই নাই। তিনি নিত্য উঠিয়া পুষ্প-বিল্বপত্র যেমন সংগ্রহ করেন, আজও সেইরূপ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ঠাকুরঘরে ফুলেরসাজি রাখিয়া নিজের ঘরে আসিয়া দেখিলেন, রাধারাণী যেন একটু বিষণ্ণ মুখে বসিয়া আছেন। বেঁদান্তবাগীশ মহাশয় তখনও সেইভাবে আপন মনে কত কথাই বলিতেছেন; তাহা শুনিয়া যুবক ঠাকুরদাসের চিত্ত যেন চঞ্চল হইল—রাধারাণীর বিষণ্ণতার কারণও যে সেই সম্পর্কীয়, তাহাও তাঁহার জানিতে বাকি রহিল না। তিনি কোনও দিন জ্যেষ্ঠের সম্মুখে সহসা উপস্থিত হইতেন না। আজও ঠাকুবঘরে সাজি রাখিবার পর, আপনার গৃহে যেন চোরের মতই আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—জ্যেষ্ঠের কথা শুনিয়া, বিশেষ সদা প্রফুল্লমুখী রাধারাণীর বিষণ্ণ-বদন দেখিয়া তিনি কত কি ভাবিতে লাগিলেন। বড়দাদা মহাশয় দাওয়ায় বসিয়া পদতলে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে আপন মনে বকিতে-ছেন। তিনি গৃহমধ্যে দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া একখানি কপাট ধরিয়া বড় সাহস করিয়া বলিলেন—"বড়দাদা, আমি না হয় এক জায়গায় চণ্ডীপাঠ করিব।"

বেদান্তবাগীশ মহাশয় শুনিয়া বড় দুঃখে ও কষ্টে হাসিয়া ফেলিলেন, পরে বলিলেন—"তা হলে আব ভাবনা কি? 'ক' য়ে কেমন করে আঁকুড়ি দিতে হয় তা কোন দিন দেখ্‌লে না আজ কিনা চণ্ডীপাঠ করবে, হা আমার অদৃষ্ট!"

ঠাকুরদাস পুনরায় বলিলেন—"না বড়দাদা, আমি চণ্ডীপাঠ

করতে পারি।" বড়দাদা কি ভাবিয়া একটু বিদ্রূপভাবেই বলিলেন—"চণ্ডীখানা এনে একটু পড় দেখি।" এই কথা শুনিয়াই নিরক্ষর ঠাকুরদাস গৃহমধ্য হইতে চণ্ডী আনিয়া দাদার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ও চণ্ডীর আবরণ-বস্ত্র উন্মোচন করিতে করিতেই কি এক অভিনব স্বরে নাভিপদ্মোত্থিত নাদগম্ভীরে প্রণবশব্দ উচ্চারণ করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—ওঁ কালীং রত্ননিবদ্ধ-নূপুরলসৎপাদাম্বুজা-মিষ্টদাং কাঞ্চী-রত্ন-দুকূল-হার-ললিতাং নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্। শূলাদ্যস্ত্রসহস্রমণ্ডিতভূজা-মুদ্ধক্ত-পীনস্তনী-মাবদ্ধামৃতরশ্মি-রত্নমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্॥ ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ॥"

পুঁথি সম্পূর্ণরূপে খোলাও হইল না, ঠাকুরদাস যখন "দেবী-সূক্তম্" আদি পাঠ সমাপন করিয়া সেই অভিনব স্বরেই গদ্‌গদ কণ্ঠে চিরপবিত্র চণ্ডীর শ্লোকগুলি যেন স্তবকে স্তবকে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তখন বেদান্তবাগীশ মহাশয় অবাক হইয়া পড়িলেন; সে অভিনব-স্বর শ্রবণে তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে, ঠাকুরদাস আবার চণ্ডীপাঠ করিবে, আবার সে পাঠ, এমন অসাধারণ বিচিত্র স্বরলহরীতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিবে। তিনি যেন আত্ম-বিস্মৃত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দক্ষিণ পদতলে যেমন ভাবে তৈল মর্দ্দন কবিতেছিলেন, সেইভাবেই তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এখন আর কোন চিন্তাই নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে মুখে হুঁ দিতেছেন। বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রী পুরুষ যে যেখানে ছিলেন, তিনি সেইখানেই বসিয়া যেন আত্মহারা হইয়া সেই অদ্ভুত চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বাহির হইতে বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে

যে ডাকিতে আসিয়াছে—সেও অবাক্ হইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া আছে, ক্রমে উঠানে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে, সকলেই রৌদ্রে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাহারও মুখে টুঁ শব্দটী নাই। কাহারও স্নান আহার নাই, প্রাতঃকাল হইতে প্রায় প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইতে চলিল, সকলেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ—যেন মন্ত্রমুগ্ধ!

যখন পাঠ সমাপ্ত হইল, তখন মনে হইল যেন কয়েকখানি সুস্বর তারের যন্ত্র কতিপয় অভিজ্ঞ যন্ত্রীর করে একতানে বাজিতেছিল, সহসা তাহার কোন একটা তার বুঝি কাটিয়া গেল, স্বর অমনি বন্ধ হইল কিন্তু তাহার ঝঙ্কার তখনই মিলাইয়া যাইল না, সকলেরই কর্ণে সেই স্বর যেন অমৃতধারার ন্যায় বহুক্ষণ ধরিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিল। তাহার পর যখন ক্রমে সে ভাবের নিবৃত্তি হইল, তখন সমস্ত ঘটনাটী যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বেদান্তবাগীশ মহাশয় আত্মস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল চণ্ডীর অর্থবোধ হইয়াছে?" ঠাকুরদাস বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "সামান্য সামান্য হইয়াছে।" বেদান্তবাগীশ মহাশয় পাঠ শুনিয়াই বুঝিয়াছিলেন, তথাপি দুই একটী প্রশ্ন করিয়া বলিলেন "তা বেশ হইয়াছে, একথা আমাকে এতদিন জানাওনি কেন? কার নিকট পড়া হচ্চে?" ঠাকুরদাস সহসা সেই তাঁতিপাড়ার বুড়া ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের নাম করিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নিকট একদিনও পাঠ অভ্যাস করেন নাই, আর বোধ হয় এমনভাবে চণ্ডীপাঠ করা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব কি না সন্দেহ। ঠাকুরদাসের যাহা কিছু শিক্ষা—সেই বিল্ববৃক্ষে কৃষ্ণ মহাপুরুষের নিকটেই, ইতিপূর্ব্বে তাহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে।

তিনি কে, সে পরিচয় ঠাকুরদাস ব্যতীত আর কেহই অবগত নহেন। তবে বোধ হয়, তাঁহারই নির্দ্দেশমত সেই বুড়া-ভট্টাচার্য্যের নাম আজ জ্যেষ্ঠের নিকট ঠাকুরদাস উল্লেখ করিলেন। যাহা হউক, বেদান্তবাগীশ মহাশয় আর অধিক কথা না বলিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে স্নানে যাইলেন। শিরোমণি মহাশয়ও কনিষ্ঠের এবম্বিধ চণ্ডীপাঠ শুনিয়া আনন্দে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন। সেইদিন হইতে কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহাদের অপরিসীম স্নেহ নিপতিত হইল এবং তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, ঠাকুরদাস যথার্থ ই ঠাকুরের দাস, দৈবশক্তিসম্পন্ন কোন প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষ তাঁহাদেরই বংশ ধন্য করিতে আসিয়াছেন।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় সে-বার ঠাকুরদাসকে তাঁহাদের ভক্ত-শিষ্য বেহালার হরগোবিন্দ হালদার মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। শিরোমণি মহাশয় বিনা বাক্যব্যয়ে স্বয়ংই রায়-মহাশয়ের বাটীতে চণ্ডীপাঠে ব্রতী হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বুড়া ভট্টাচার্য্য।

ইংরাজী অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের জনৈক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বরাহনগরে তন্তুবায় পল্লীতে আসিয়া বসবাস করিলেন। তিনি যেমন নানাশাস্ত্রদর্শী সুপণ্ডিত, তেমনি পরম রূপবান্ পুরুষ; তাঁহার সহধর্ম্মিণীও ততোধিক পরমাসুন্দরী ও সাক্ষাৎ কমলা-সদৃশা ছিলেন। তবে তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। তিনি অনতিকালমধ্যে তথায় এক চতুষ্পাঠী স্থাপন

করিয়া নিত্য বহু বিদ্যার্থীর অধ্যাপনা দ্বারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে তাহা "তাঁতিপাড়ার বুড়া-ভট্টাচার্য্যের চতুষ্পাঠী" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কোন স্থলে একথা বলা হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের তুলনায় সাধনার খ্যাতিও নিতান্ত কম ছিল না; তিনি যেমন কঠোর সাধন-পরায়ণ ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন, তেমনি একজন মহা-বৈদান্তিক বলিয়াও পণ্ডিতসমাজে পরিচিত ছিলেন। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, আমাদিগের ঠাকুরদাসের প্রপিতামহ বৃদ্ধ রামমাণিক্য বিদ্যাসাগর ইঁহার দীক্ষাগুরু ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাধনশক্তির পরিচয় সে কালে বিশ্ববিশ্রুত ছিল; ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারিয়া সহজেই তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন ও যথাসময়ে তাঁহার দীক্ষা ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলেন। তাহার পর প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল অতীত হইয়া গিয়াছে, তুষারশুভ্র-দীর্ঘ কেশশ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদনুরূপ বৃদ্ধ সহধর্ম্মিণী সহ সেই তাঁতিপাড়া চতুষ্পাঠীতেই নিয়মিত অধ্যাপনা করিতেছেন। এখন কেবল বেদান্তপাঠার্থী ছাত্রবৃন্দই তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসেন। শতাধিক বয়স্ক বৃদ্ধ হইলেও তিনি নিতান্ত অথর্ব্ব হইয়া পড়েন নাই, তাঁহার নিত্য গঙ্গাস্নান, পুষ্পচয়ন, বহুক্ষণ ব্যাপি সাধন-ক্রিয়া কোন্ দিনই বন্ধ হইত না। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সামান্য মাত্র হীন হইলেও তাঁহার বৃদ্ধা গৃহিণী তাহা তাঁহাকে বিশেষ উপলব্ধি করিতে দেন নাই। সেই শঙ্খকঙ্কণধারিণী সিন্দুর-সিমন্তিনী শুভ্রকেশা ব্রাহ্মণকন্যা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্ব কার্য্যের সহায়তা করিতেন, আবার গৃহে আসিয়া

সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার ন্যায় সমস্ত গৃহকর্ম্ম ও রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বামী ও পুত্রপ্রতিম ছাত্রদিগকে অতি যত্নসহকারে পরিতোষে ভোজনাদি করাইতেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের মুনিঋষির-তপোবন-সদৃশ সংসারের তুলনা দিবার কিছুই নাই। সাক্ষাৎ ঠাকুর-ঠাকুরাণীর ন্যায় তাঁহারা পরমানন্দেই দিনাতিপাত করিতেন। তাঁহাদের এইরূপ পবিত্র সুখ ও স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। পল্লীবাসী সকলেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একান্ত অনুরক্ত ছিল, গৃহজাত শাক-পাতা-ফল-মূল তাঁহাদের না দিয়া কেহ অন্য কাহাকেও দিত না এবং আপনারাও ভোজন করিত না। তবে কেবল কতিপয় ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের জনকজননী সতত বৃদ্ধকে উৎকট অভিসম্পাত করিতেন, এবং তাঁহার নিকট যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিত, তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণকে সেস্থলে তাঁহাদের সন্তানদিগকে পাঠাইতে নিষেধ করিতেন তাহার কারণ কোন কোন ছাত্র বৃদ্ধের নিকট বেদান্তাদির পাঠ সমাপ্ত করিয়া পরিণামে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই পিতামাতা প্রাণারাম সেই পুত্রদিগকে সংসারধর্ম্মে আবদ্ধ করিতে না পারিয়া, তাঁহাদের বড় আশায় নৈরাশ্য প্রাপ্ত হইয়া বৃদ্ধ বয়সে যখন প্রতিপদে তাঁহাদের নয়নমণি, জীবনের একমাত্র আশাভরসা, অবলম্বন স্বরূপ পুত্ররত্নের অভাব অনুভব করিতেন, তখনই বৃদ্ধ ভটাচার্য্যকে তাঁহারা "চক্ষের-মাথা-খা" বলিয়া অভিসম্পাত করিতেন। অনেকেই বলিত বৃদ্ধ তাহাতে বৃদ্ধবয়সে ক্ষীণদৃষ্টি হইয়াছিলেন। যাহাহউক, বৃদ্ধ তাহাতে কোন দিন ক্ষুব্ধ হন নাই বা অধ্যাপনা কার্য্য বন্ধও করেন নাই। তিনি সকল সময়েই অতি আনন্দে

থাকিতেন ও বেদান্তের উপদেশ প্রদান করিতেন। তাহার শেষ ছাত্রগণের মধ্যে কালীচরণ মৈত্র, সন্ন্যাসীচরণ মৈত্র, চিন্তামণি ও ঠাকুরদাসই প্রধান। ঠাকুরদাস প্রথম হইতে তাঁহার ছাত্র না হইলেও পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত চণ্ডীপাঠের পর হইতে তাঁহার ছাত্ররূপে নিত্য যথা সময়ে বেদান্তের উপদেশ গ্রহণ করিতে যাইতেন; কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার নিত্যকর্ম্ম—সেই গভীর নিশায় বিল্বমূলে যাওয়া তাঁহার বন্ধ ছিল না। পত্নী শ্রীমতি রাধারাণীর নিকট তিনি কোন কথাই গোপন করিতেন না। পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহারই মুখে তাঁহার জীবন-কাহিনী শ্রুত হওয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধ-ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠাকুরদাসের জন্মকাল তথা প্রথম বাক্যোচ্চারণ হইতে সকল বিষয়েই এতদিন সংবাদ রাখিতেন, তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট কোন মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন, সেই কারণ এক্ষণে তাঁহাকে ছাত্ররূপে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত বেদান্তের আলাপনকালে, যে সকল গভীর ও অভিনব তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা তৎপূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং ঠাকুরদাসকে পাইলে বৃদ্ধের আনন্দের অবধি থাকিত না। বৃদ্ধ বোধ হয় এত-কাল কেবল এই ঠাকুরদাসের জন্যই লোলচর্ম্ম ও পলিতকেশ হইয়া জীবন ধারণ করিয়া আছেন। ঠাকুরদাসকে শিক্ষা-দীক্ষা প্রদান করাই তাঁহার জীবণের শেষ কার্য্য বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। তিনি সেই সময়ে যেরূপ নূতন বলে ও অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। ঠাকুরদাসও এ হেন অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য মহা-শয়কে পাইয়া বড় কম আনন্দিত হন নাই, তাঁহার মনের যে

সকল ভাব এতাদিন কেবল মনে মনেই নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইত, এখন প্রাণ পূরিয়া তিনি সেই সকল ভাব প্রকাশ করিবার অবসর পাইয়াছেন; অধ্যাপক ও সতীর্থদিগের সহিত তাহার যথাযথ বিচার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার সেই অদ্ভুত মেধা ও দৈবীশক্তিসম্পন্ন যুক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞান দেখিয়া সকলেই এখন মোহিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়, বেদান্তবাগীশ ও চূড়ামণি মহাশয় সন্ধ্যার পর একত্র উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করিয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতেন।

এই ভাবে আরও কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠাকুরদাসকে, শেষ দীক্ষা প্রদান করিয়া মহাপ্রস্থান করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিল, ছাত্রেরা তাঁহাকে সজ্ঞানে তীরস্থ করিলেন। বৃদ্ধাও হৃষ্টচিত্তে হরিনাম করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন। গঙ্গাতীরস্থ বৃদ্ধ অধ্যাপক মহাশয় গদ্‌গদ কণ্ঠে ছাত্রবৃন্দকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, অনন্তর ঠাকুরদাসের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া তাঁহার কর্ণে অনুচ্চস্বরে কি বলিলেন। ঠাকুরদাসও স্বীয় মস্তক অবনত করিয়া বিনীতভাবে তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই বৃদ্ধের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী তাহাতে কিঞ্চিৎমাত্রও ক্ষুব্ধা হইলেন না। অপিচ ছাত্রগণকর্ত্তৃক বিরচিত চিতার উপর তাঁহার স্বামী শেষ শয্যায় শায়িত হইলে, তিনি অতীব হৃষ্টচিত্তে তাঁহার মুখাগ্নিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং অনতিদূরেই উপবেশন করিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতার প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যখন স্বামীর দেহ

ভস্মীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন বৃদ্ধা একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, কিন্তু অধিকক্ষণ সেভাবে দাঁড়াইতে পারিলেন না, আবার বসিয়া পড়িলেন, ক্রমে সেইস্থানেই শুইয়া পড়িলেন। ছাত্রগণ বৃদ্ধার এবংবিধ অবস্থা দেখিয়া কেহ বাতাস করিতে লাগিলেন, কেহ বা মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সতীলক্ষ্মী সে সকলের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জীবনের চিরসঙ্গী ও ইহ পরকালের আশ্রয়স্থল প্রত্যক্ষ দেবতা-স্বরূপ স্বামীর অনন্ত পথে অনুসরণ করিলেন। তাঁহার শরীর দেখিতে দেখিতে শীতল হইয়া আসিল।

ইতিপূর্ব্বেই দেশপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও সাধক-শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শেষ লীলা দেখিবার জন্য শ্মশানঘাটে বহু নরনারীর জনতা হইয়াছিল, এক্ষণে পরম সাধ্বী সাক্ষাৎ ভগবতী-প্রতিমা মা-ঠাকুরাণীর সহমরণ-সংবাদ পাইয়া, বহু দূরদুরান্তর গ্রাম সকল হইতেও বিপুল লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলে ভক্তিসহকারে তাঁহার চরণ পূজা করিয়া তাঁহার স্বামীর জ্বলন্ত চিতার উপর তাঁহাকে শয়ন করাইয়াদিলেন। চারিদিকে আনন্দ কোলাহল ও খোল করতাল সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। সে এক অপূর্ব্ব ভাব, মা যেন হাসিতে হাসিতে অনন্তশিখ ব্রহ্মার ক্রোড়ে স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া সগর্ব্বে উঠিয়া বসিলেন। অল্পকাল মধ্যেই দিব্য হুতাশন হুহু শব্দে সপ্ত শত-জিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার নিত্য কার্য্য সমাধা করিয়া, বাষ্পাকারে তাঁহাদিগকে অনন্তধামে প্রেরণ করিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন তদ্দেশবাসী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাদের চিতার বিভূতি লইয়া সেই নির্ব্বাণোন্মুখ চিতায় অবিরত গঙ্গার পূত সলিল সিঞ্চনে

শীতল ও বিধৌত করিয়া দিলেন। অনন্তর সকলে চলিয়া যাইলে, ঠাকুরদাস ও তাঁহার সতীর্থ সন্ন্যাসীচরণ পঞ্চবটীমূলে সিদ্ধবাবার নিকট যাইয়া উপবেশন করিলেন। ভৈরবী মা দূর হইতে সকল ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, এক্ষণে পঞ্চবটীর নিকটে আসিয়া ঠাকুরদাসকে বলিলেন—"তোরা ভাবচিস্ কি? ওরা ত সব কাজ সেরে চলে গেল, এখন তোদের কাজ তোরা কর্। আগামী মঙ্গলবার অমাবস্যা মনে আছে ত? আমার সঙ্গে দেখা করিস্।" তারপর তিনি সিদ্ধবাবাকে নমস্কার করিয়া, গ্রামমধ্যে চলিয়া গেলেন। সিদ্ধবাবাও ভৈরবীমাকে প্রতি-নমস্কার করিয়া ঠাকুরদাস ও সন্ন্যাসীচরণের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্বন্ধে কত কথাই বলিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে তাঁহারা বাবাজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ছাত্রগণ সকলেই অশৌচ গ্রহণ করিলেন; কেবল ঠাকুরদাস ও সন্ন্যাসীচরণ যথাযোগ্য ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিয়া গ্রামস্থ দেওয়ানবাবুদিগের সহায়তায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও ভিখারীদিগকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া দিলেন। অনন্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একটী প্রবীণ ছাত্রকে আনাইয়া সেই চতুষ্পাঠী রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কালীচরণ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত শেষ ছাত্রগণও চতুষ্পাঠিতে মধ্যে মধ্যে নানা বিষয়ের অধ্যাপনা করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাম রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভৈরবী-মা।

আজ চতুর্দ্দশী-সংযুক্ত-অমাবস্যা মঙ্গলবার, সিদ্ধবাবা শ্মশানঘাটে ধুনী জ্বালিয়া বসিয়া আছেন, সন্ন্যাসীচরণ ও ঠাকুরদাস তাঁহার নিকট বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেছেন, অদূরে দেওয়ান-বাবুর উদ্‌যোগে মহামায়ার পূজার আয়োজন হইয়াছে। দেওয়ান-বাবু বরাহনগরের অন্যতর জমিদারবংশের সন্তান। ইনি স্বয়ং কোন স্থলে দেওয়ানী কার্য্য গ্রহণ করেন নাই। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি নবাব সরকারে উক্তকার্য্য করিয়া বংশ-পরম্পরায় দেওয়ান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দুর্গাচরণ দেওয়ান বা দাওয়ান এই বংশের মহাশক্তিশালী-পুরুষ। তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণও পিতার উপযুক্ত পুত্র। বয়স অল্প হইলেও ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন ভজনে ইহাদের প্রগাঢ় নিষ্ঠা, সাধুসজ্জনের প্রতি অগাধ ভক্তি, সকল সৎ কর্ম্মেই ইহারা বদ্ধ-পরিকর ও মুক্তহস্ত। আজ শ্মশানেশ্বরীর পূজায় তাই দেওয়ানবাবুরই উদ্‌যোগ আয়োজন অধিক। পূজার আয়োজন সম্পন্ন হইলে, আমাদিগের ঠাকুর দাসের মধ্যম সহোদর বীরাচার-সাধনব্রত ঈশানচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয় মহানিশায় পূজায় বসিলেন। বীরাচারে "কারণ" ব্যবহার করার রীতি আছে, তিনি যথাবিধি কারণ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পূজা সমাধা হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। এতক্ষণ সিদ্ধবাবার ধুনীর নিকট বসিয়া ভৈরবীমা, ঠাকুরদাস

ও সন্ন্যাসীচরণকে সাধন বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিতে-ছিলেন। তখন সিদ্ধবাবা নয়ন মুদ্রিত করিয়া আপনার ভাবে বিভোর হইয়া সমাধি মগ্ন ছিলেন। যখন পূজা সমাপ্ত হওয়াব শঙ্খ ঘণ্টা সব বাজিয়া উঠিল, তখন সকলেই যেন চমকিত হইয়া, সেইদিকে নিরীক্ষন করিতে লাগিলেন। শ্যামাচরণ ভৈরবীমার পরম ভক্ত, তিনি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"মা চূড়া-মণিদাদাব ত পূজা হ'ল, এখন আমাব পূজা যে বাকি মা! তোমার কৃপা না হ'লেত তা' সম্পন্ন হবে না? একবার দয়া করে উঠে এস।" ভৈরবীমা খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া বলিলেন "তুই যেমন পাগল ছেলে! চূড়ামণির পূজো আর তোর পূজো কি আলাদা? এখন আমার এ ছেলেদের ভারি ক্ষিদে পেয়েছে, মায়ের প্রসাদ এনে দে দেখি।" শ্যামাচরণ স্বতন্ত্র রক্ষিত পুষ্প-পাত্র আনিযা ভৈরবীমার চরণ পূজা করিলেন, তাঁহার এবং সিদ্ধ-বাবার ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসীচরণ ও ঠাকুরদাস মায়ের পার্শ্বে বসিয়াই প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

ভৈরবীমা অধিকাংশ সময় শ্মশানেই থাকেন, কখন কখন পঞ্চবটী তলায়, আবার কখনও বা দেওয়ানদের দেউড়ীতে বসিয়া থাকেন। অনেক সময়ে তিনি পথিপার্শ্বে ক্রীড়া-পরায়ণ বালক-বালিকাদিগেব সহিত নিতান্ত বালিকা কুমারীর ন্যায় মনের আনন্দে ক্রীড়া করিযা থাকেন, আবার বৃদ্ধ বৃদ্ধাদিগের সঙ্গেও অসঙ্কোচে আলাপ করিতে তিনি কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। কখন তিনি গ্রামের মধ্যে ইতস্তত: বিচরণ করেন, আবার কখন বা গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় যে চলিয়া যান্ কেহ তাহার সন্ধানও জানিতে পারে না। তিনি দীনের জননী, ধনীর পূজ্যা ও

সাধুসন্ন্যাসীর সাধন-সঙ্গিনী। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া অসম্ভব বা নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। কোনও বাটীতে কাহারও শিশু সন্তান সঙ্কটাপন্নভাবে পীড়িত, ভৈরবীমা তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন, বলিতেছেন—"কোন ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাক্।" মা "নিশ্চিন্ত থাক্" বলিলে কাহারও আর ভয় থাকেনা। লোকে তাঁহাকে যথার্থই ভগবতী বলিয়া বিশ্বাস করে। শুনিতে পাওয়া যায়, যতদিন তিনি ছিলেন, ততদিন নিকটবর্ত্তী গ্রামগুলির মধ্যে কেহ অকালমৃত্যু দেখিতে পায় নাই। মা অনেকদিন গ্রামে নাই, হয়ত কোন পরিবার মৃত প্রায় শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া অবিরত ক্রন্দন করিতেছেন আর নিতান্ত ক্ষুন্নমনে বলিতেছেন, "হায় হায় আজ যদি মা থাকিতেন, তাহা হইলে ছেলেটী নিশ্চয় রক্ষা পাইত।" আশ্চর্য্যের কথা, মা সেই দিবসেই কোথা হইতে আসিয়া শিশুকে একেবারে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেন ও তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতেন, আর বলিতেন "ভয় কি? তোরা মার ভক্ত, প্রাণ ভরে মাকে ডাক্, সব বিপদ কেটে যাবে।" দেখিতে দেখিতে শিশু দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিত।

ভৈরবীমায়ের সম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা গ্রামবাসী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা-দিগের মুখে এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার আত্মপরিচয়ে তিনি বলিতেন, নদীয়া কৃষ্ণনগরে রাজপুরোহিত-বংশে জনৈক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। শৈশব হইতেই পূজা অর্চ্চনা, সাধন ভজনে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, সাত আট বৎসরের সময় যখন তিনি ফুলের সাজি হাতে করিয়া ফুল তুলিয়া আনিতেন, গ্রামবাসী সকলেই তাঁহাকে মা জগদম্বা বলিয়া প্রণাম

করিত। তিনি পিতার পার্শ্বে বসিয়া যখন একাগ্রমনে পূজার অনুকরণ করিতেন, তখনই এক একদিন এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, পিতা পূজাদি সমাপন করিয়া উঠিয়া যাইলেও তিনি একভাবেই বসিয়া থাকিতেন, কেহ না ডাকিলে তাঁহার সেই ভাব সহজে ভঙ্গ হইত না। তাঁহার বয়স ক্রমে দশ বৎসর হইলে পিতা কন্যার বিবাহ দিবার মানসে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি সরল অথচ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"বাবা আমার বিয়ে দিওনা, বিয়ে দিলে আমি ঘরে থাকৃতে পারো না।" কুমারী বালিকা কন্যার মুখে এরূপ অদ্ভুত কথা শুনিয়া পিতা প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, পরে পুনঃ পুনঃ তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইতে লাগিলেন ও কন্যাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন; সে কথায় আর কর্ণপাত না করিয়া সত্বর শুভলগ্নে কন্যাকে পাত্রস্থ করিলেন। কন্যা পিতৃ আজ্ঞার উপর আর কোন কথা কহিলেন না, তবে তিনি কাঠের পুতুলের মত যেন আড়ষ্ট হইয়া রহিলেন। সম্প্রদান-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল, বর-কন্যা যথারীতি বাসরঘরে প্রবেশ করিলেন। ইতি মধ্যে কন্যা বাহিরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কোন আত্মীয়া তাঁহাকে গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থাতেই খিড়কীর দ্বার দিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। আত্মীয়া প্রদীপ হস্তে দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মেয়েটী গাছের পাশ দিয়া চুপি চুপি কোথায় সরিয়া পড়িলেন। অনেক দেরি হইতেছে দেখিয়া আত্মীয়া তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, কোন সাড়া শব্দ না পাওয়ায় প্রদীপ ধরিয়া এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর বাটীর মধ্যে সংবাদ দিলেন। তখন সকলে ঘরে বাহিরে চতুর্দ্দিকে মশাল লইয়া অনুসন্ধান করিতে বাহির

হইল, কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এতটুকু মেয়ে এই মাত্র বাহির হইল, আর দেখা নাই, সকলেই যেন অবাক্। কেহ কেহ অনুমান করিলেন, হয় বাঘে লইয়া গিয়াছে, না হয় খিড়কির পুষ্করিণীতে ডুবিয়া গিয়া থাকিবে, সেই হিসাবেও বহু অনুসন্ধান হইল, যখন কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন হতাশ হইয়া সকলে বাড়ীতে ফিরিলেন। এ দিকে বালিকা খিড়কির দ্বার পার হইয়াই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন; কোথায় যাইবেন. কোন পথে যাইবেন, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই; আপন মনে যে দিকে দুই চক্ষে পথ বলিয়া বোধ হইতেছে, প্রাণপণে সেইদিকেই ছুটিতে ছুটিতে ক্রমে গ্রাম, প্রান্তর, আবার গ্রাম, আবার প্রান্তর পার হইয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তিনি এক গ্রামের প্রান্তভাগে একটী ভগ্ন মন্দিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমস্ত রাত্রি অবিরত ভীষণ পরিশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়া সেই নির্জ্জন মন্দিরের রোয়াকে একটু বিশ্রামের জন্য শুইবামাত্রই বালিকা একেবারে ঘুমাইয়া পড়িলেন। গ্রামের বাহিরে পরিত্যক্ত মন্দির, চারিদিকে জনমানবের আবাস পরিশূন্য; সুতরাং কেহই তাঁহাকে তখন দেখিতে পাইল না। বালিকা অবসন্ন দেহে নিদ্রা যাইতেছেন। মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়, গৈরিকবস্ত্রপরিহিতা ত্রিশূলধারিণী এক সন্ন্যাসিনী আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ও সেই বালিকাকে এতদবস্থায় নিদ্রিতা দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আদর করিয়া আপন কোলে বসাইলেন; কোথা হইতে আসিয়াছেন, কেনই বা এমন অবস্থায় আসিয়াছেন সকল কথা ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিয়া

নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে স্নান করাইয়া আনিলেন; এবং ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি লইয়া সেই মন্দির-সংলগ্ন একটী কুটীর মধ্যে রন্ধনাদি সমাপন পূর্ব্বক মন্দিরস্থিত শিবের ভোগ অর্চ্চনা করিলেন, তাহার পর বালিকাকে ভোজন করাইলেন, নিজেও ভোজন করিলেন। অপরাহ্নকাল নানা কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত হইলে সন্ধ্যা সমাগমে সন্ন্যাসিনী মন্দিরে প্রদীপ দিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন। বালিকা তাঁহার যত্নে যেন সব ভুলিয়া যাইলেন, সন্ন্যাসিনীও কন্যা-নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন। বালিকার পূজা, পাঠ, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও ঈশ্বর তন্ময়তা দেখিয়া তিনি বস্তুতই যেন মুগ্ধ হইয়া যাইলেন। তিনি প্রাতঃকালে ভিক্ষায় বহির্গত হইয়া যাইলে মেয়েটী পূজাপাঠের সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিতেন, রন্ধনাদিরও সমস্ত উদ্‌যোগ করিয়া মন্দির মধ্যে একাগ্রভাবে ভগবচ্চিন্তা করিতেন। সন্ন্যাসিনী আসিয়া রন্ধনাদি সমাপন করিলে, ঠাকুরের ভোগ দিয়া উভয়ে ভোজন করিতেন। এই ভাবে প্রায় পাঁচ ছয় মাস অতীত হইয়া যাইল, কেহই সে স্থানে তাঁহার অনুসন্ধানে আসিল না। নিকটস্থ গ্রাম্যলোক তাঁহাকে সন্ন্যাসিনীর কন্যা বলিয়াই বুঝিল। ক্রমে এক দুই করিয়া কয়েক বৎসরও অতিবাহিত হইল, যৌবনের অলঙ্ঘ্য প্রভাব তাহার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার সুপ্ত দৈবীভাব এখন পবিত্র মাতৃভাবে সমুজ্জল হইয়া উঠিল এতদ্ব্যতীত তাঁহার নয়নে আরও কি এক অপূর্ব্ব ভাব পরিলক্ষিত হইল. তাহা সহজে বর্ণনা করিতে পারা যায় না। বোধ হয় সতত নির্জ্জনে সমাধিমগ্ন থাকায় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় যেন স্থায়ী শিবনেত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে, চক্ষুগোলক আর নিম্ন পল্লবপ্রান্ত স্পর্শ করে না, অথচ নিম্নমুখী না

হইয়াও সকল কার্য্য অবাধে সম্পন্ন হইতে থাকে। সে অপূর্ব্ব দৃষ্টি দেখিয়া অতি বড় পাষণ্ডও তাঁহাকে ভগবতী জ্ঞানে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার আশ্রয়দাত্রী সন্ন্যাসিনী যেমন বিদুষী ও নানাশাস্ত্রজ্ঞ তেমনি সাধন ক্রিয়াবতী ছিলেন; সুতরাং তাঁহার নিকট থাকিয়া তিনিও রীতিমত সাধন ভজনের সমস্ত ক্রিয়া-পদ্ধতি ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে তীর্থ-দর্শন করিবার অভিলাষে তাঁহারা উভয়ে দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নানা দেশ ও বহু তীর্থ পর্যটন করিয়া তাঁহারা নর্ম্মদাতীরে এক অতি পবিত্র ও মনোরম তপোবনের অন্তর্গত এক ভৈরবী-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময় কয়েকটী সিদ্ধ-ভৈরবী তথায় বাস করিতেন, আমাদের ভৈরবী-মা সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের নিকটেই প্রথমে ভৈরবী-ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইলেন। এই আশ্রমে প্রবেশ করিবার কিছুদিন পরেই তাঁহার পূর্ব্ব-উপদেষ্ট্রি সন্ন্যাসিনী সহসা সেই নর্ম্মদাতীরে দেহরক্ষা করেন। সেই কারণে মা আর কোথাও না যাইয়া দ্বাদশ বৎসর কাল এই আশ্রয়ে থাকিয়াই একাগ্রমনে সাধনা করিতে লাগিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধ হইলে আশ্রমাধিষ্ঠাত্রী বৃদ্ধা ভৈরবী মাতার আদেশে পুনরায় তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এই সময় তিনি উত্তরাখণ্ডস্থিত দিগম্বরী ভৈরবীমঠে আসিয়া উপস্থিত হন। এই মঠে কোন পুরুষের সমাগম নাই, সকল ভৈরবীই মঠমধ্যে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় সতত বিচরণ করেন। তাঁহাদের বিলম্বিত দীর্ঘ কেশদাম উগ্র পিঙ্গল বর্ণ জটায় পরিণত হইয়াছে, গলে রুদ্রাক্ষমালা, কপালে উজ্জ্বল সিন্দুরলিপ্ত, সকলেই ত্রিশূল ও কপাল-পাত্র-ধারিণী, যেন শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশিনী রণ-

রঙ্গি৺া জগজ্জননী মহাকালী ; অপূর্ব্ব মাতৃভাব-পুষ্টা স্মেরাননা ও পূত-স্নেহময়ী আমাদের ভৈববী-মা এই আশ্রমে আসিয়াই আশ্রম-বিধানে অনুপ্রাণিতা ও দীক্ষিতা হইলেন এবং একাদিক্রমে আবও ছয় বৎসর কাল এই আশ্রমের সেবা করিয়া একবার হবিদ্বাবেব কুম্ভমেলায় মঠস্থিতা ভৈরবী দিগেব সহিত স্নান কবিতে আসিলেন। কুম্ভমেলায় অগণ্য সাধুসজ্জন মহাত্মা ও মহান্তদিগেব এবং সাধারণ ভক্তলোকারণ্যেব মধ্যে তাঁহাদেব সম্মান অপরিসীম। তাঁহারা যথন বম্ বম্ শব্দে চারিদিক বিকম্পিত করিয়া স্থিব গম্ভীরভাবে পবিত্র জাহ্নবীজলে অবগাহন করিতে লাগিলেন, তখন চতুর্দ্দিকে পঙ্গপালসদৃশ জনসঙ্ঘ চিত্রার্পিতেব ন্যায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাঁহারা স্নান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর অন্য সকলে ধীরে ধীরে স্নান করিবার অনুমতি পাইলেন। শুনা যায় বহু ধ'্মানুরত ভক্তমণ্ডলী প্রতি গ্রীষ্মঋতুতে হরিদ্বারে স্নান করিতে আসিয়া তাঁহাদের মঠদ্বারে বৎসবোপযোগী আহার্য্য সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। ইঁহাদের সংখ্যা তেমন অধিক নহে এবং কুম্ভে গঙ্গাস্নান ব্যতীত লোকালয়ে ইহাবা কখন আগমন কবেন না। সেই কাবণ সাধারণে ইঁহাদের বিষয় এক প্রকার অনভিজ্ঞ। আমাদেব ভৈরবী-মা এই হরিদ্বার হইতেই তাঁহার সঙ্গিনী ভৈরবীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার নানা তীর্থ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক ৺কালীঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনেকদিন তথায় শ্মশানঘাটে থাকিয়া এক্ষণে ববাহনগরের এই শ্মশানে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন। এখনও তিনি দিগম্বরীমঠের অনুরূপ সম্পূর্ণ বিবস্ত্রাভাবেই অবস্থান করেন, কেবল একখানি গৈরিক উত্তরীয় মাত্র তাঁহার স্কন্ধ হইতে সতত

বিলম্বিত থাকে। তাঁহার কেশে একটীও জট্ নাই, তৈল ম্রক্ষিত না হইলেও তাহা রুক্ষ নহে, সেরূপ সুদীর্ঘ কেশ কদাচ পরিলক্ষিত হয়। মা চলিয়া যাইতেছেন তাঁহার উন্মুক্ত কেশপাশ যেন ভূমি-তল চুম্বন করিতে করিতে লুটাইয়া যাইতেছে. আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাতে ধূলা কাদা কাটিকুটী কিছুই স্পর্শ করে না। তাঁহার ঈষৎ-নীল-আভা-বিশিষ্ট শ্যামবর্ণ অপূর্ব্ব দেহ-কান্তির সহিত সেই গৈরিক উত্তরীয়খানি ও ভূমিস্তলস্পর্শিত দীর্ঘ কেশদাম বাস্তবিকই তাঁহার গম্ভীর রূপের পূত-শোভা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়াছে। তাঁহার রূপ দেখিয়া কেহই তাঁহার বয়স অনুমান করিতে পারিত না।

ভৈরবী মা এখানে আসিয়া অবধি আমাদের ঠাকুরদাসের প্রতি সমান লক্ষ্য রাখিয়াছেন ও তাঁহার সাধনার পথে এতদিন সম্পূর্ণ সহায়তা করিয়া আসিতেছেন। গভীর নিশায় বিল্বমূলে বৃদ্ধ মহাপুরুষের নিকট ঠাকুরদাসের শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধেও মায়ের কিছু অবিদিত ছিল না। ঠাকুরদাস এখন অধিকাংশ সময় ভৈরবীমার নিকটেই অবস্থান করিয়া থাকেন। কোন কোন দিন মা নিশাকালে বিল্বমূলেও দেখা দিয়া থাকেন। ইতিমধ্যে একদিবস মা বিল্বমূলে আসিয়া সেই মহাপুরুষের উপদেশক্রমে সহসা কোথায় যে অন্তর্হিতা হইলেন, কেহ তাহা নির্ণয় করিতে পারিল না। ঠাকুরদাসও সেকথা তখন জানিতে পারিলেন না। এদিকে মায়ের অদর্শনে গ্রামবাসী সকলেই অত্যন্ত কাতর ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তীর্থযাত্রা।

অনন্তকালস্রোতের মধ্যে অনেক সময় যেন এমন এক একটী তরঙ্গ আসে, যাহার সহিত বিশ্বনাথ মহাকাল সংসারতপ্ত জীবের শান্তি ও মঙ্গলের জন্য কত অপূর্ব্ব রত্ন তীরে উঠাইয়া দেন, যাঁহাব সন্দর্শনে বাস্তবিক তদানীন্তন জীব আবার কিয়দ্দিবসের জন্য সাধু সঙ্গে সৎপথে ভগবচ্চিন্তায় পবিচালিত হয়। আরও বিচিত্র কথা এই যে, সেই বত্নের পুষ্টি, পবিচয়, রক্ষা ও সৌন্দর্য্য বিধানের জন্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই বা তাহার পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি অভিজ্ঞ রত্নজিবী বা বহুদর্শী জহুরীরও আবির্ভাব হইয়া থাকে। বাস্তবিক তাঁহারা না থাকিলে সেই অভিনব রত্নের যথার্থ পরিচয় পাওয়া সকলের পক্ষে অসম্ভব হইত। বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি জগতের মহারত্ন স্বরূপ মহাপুরুষগণের জীবনী-আলোচনায় তাহা অতি সুস্পষ্টরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সিদ্ধবাবা, ভৈববী-মা প্রভৃতি মহাত্মাগণ বোধ হয় সেই কারণে পূর্ব্বাহ্নেই বরাহনগবে আসিয়া আসন পাতিয়াছিলেন, ক্রমে সাধকরত্ন ঠাকুরদাসেব শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনার সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা ও সহায়তা করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহারা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইতেছেন।

বুড়াভট্টাচার্য্য মহাশয় কালের গতিকে সশক্তি অনন্তধামে চলিয়া যাইলেন বটে, কিন্তু ভৈরবী-মা প্রভৃতি সে পথে না চলিয়া

সহসা কি উদ্দেশ্যে কোথায় অন্তর্দ্ধান হইলেন; সিদ্ধবাবাও কোন সময়ে কোথায় চলিয়া যাইবেন কি না, কে জানে! এখন ঠাকুরদাসের একমাত্র আশ্রয়স্থল সিদ্ধবাবা, তিনি তাঁহার নিকট হঠযোগের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিদ্ধবাবা হঠযোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, তিনি আজ কাল বড় কোথাও যাওয়া আসা করিতেন না, যে স্থলে বসিয়া থাকিতেন, সেই স্থলেই আপন ভাবে বিভোর হইয়া সমাধিমগ্ন হইয়া যাইতেন। গ্রামবাসী ভক্তগণ যে যাহা আনিয়া দিত, তাহাই আনন্দ-সহকারে তিনি সেবা করিতেন।

সন্ন্যাসীচরণ ঠাকুরদাসের অতি প্রিয় সহচর, সেই কারণ সিদ্ধবাবার নিকট উভয়কেই অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যাইত। কালীচরণ ও চিন্তামণি ঠাকুরদাসের বিশেষ বন্ধু হইলেও তাঁহারা সকল সময় ঠাকুরদাসের সঙ্গে থাকিতেন না। তবে সময় সময় তাঁহারাও সিদ্ধবাবার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতেন। ঠাকুরদাসের অসাক্ষাতে সিদ্ধবাবা তাঁহাদের সকলকেই বারবার বলিতেন যে, "ঠাকুরদাস দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ, এমন রত্নকে এখনও কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু ও বেশী দিন আর সংসারে থাকিবে না। ও মনে মনে সংসার ত্যাগের অবসর খুঁজিতেছে। তোমরা তাহাকে সাধ্যমত যত্ন করিও।" অন্য কেহ ঠাকুরদাসকে ঠিক বুঝিতে না পারিলেও সন্ন্যাসীচরণ কিন্তু বেশ বুঝিয়াছিলেন। সেই কারণ তিনি তাঁহাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন ও সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। ঠাকুরদাস সততই অচঞ্চল ধীর-স্থির-গম্ভীর; সকলের সঙ্গেই তাঁহার অমায়িক ভাব, কিন্তু কাহারও অসদাচরণ তিনি আদৌ দেখিতে পারিতেন না; এমন কি প্রতিবাসী বৌ-ঝি-দিগেরও নির্লজ্জভাব

দেখিলে তিনি যথেষ্ঠ তিরস্কার করিতেন। এ বিষয়ে তিনি পরিচিত বা অপরিচিত কিছুই মানিতেন না। আবশ্যক হইলে তাঁহাদের কর্ত্তৃপক্ষদিগকেও সে সম্বন্ধে উপদেশ ও সাবধান করিয়া দিতে ক্রটী করিতেন না। সেই কারণ গ্রামের স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, সকলেই তাঁহাকে যেমন ভয় তেমনি ভক্তি করিতেন। প্রতিবাসী বৌ-ঝিরা সময় সময় রাধারাণীর নিকট তাঁহার স্বামীর অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য ও লোকশিক্ষা সম্বন্ধে প্রশংসা করিতেন। বাস্তবিক ঠাকুরদাসের তিরস্কারও এমন মধুর ছিল যে, তাহাতে কেহই অসন্তুষ্ট হইত না। তাঁহাকে দেখিলে সকলেই যেন একটু সঙ্কুচিত হইয়া কিরূপে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিবেন, তাহার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িতেন। তিনিও সে সময় সকলকে সস্নেহে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। রাধা-রাণীও তাঁহারই গৃহিণী—তাঁহাকে ভাল বাসে না এমন লোক নাই; তাঁহাকে একবার না দেখিয়া, তাঁহার সহিত দুটা কথা না কহিলে কাহারও যেন তৃপ্তি হয় না, দিন কাটে না। তিনি এখন ত আর বালিকাটী নাই, তিনিই এখন বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা দুই যা'ই ক্রমে ক্রমে স্বর্গা-রোহণ করিয়াছেন. কাজেই সংসারের সমস্তই তাঁহার হাতে। তিনি যাহা না করিবেন, তাহা হইবে না। ঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁহার সংসারও এখন বড় হইয়াছে। এখন তিনি তিনটী কন্যার জননী। বড়টীর বয়স প্রায় সাত আট বৎসর, মেজটী পাঁচ বৎসরের এবং ছোটটী সবে মাত্র ভূমিষ্ঠা হইয়াছে। তিনটীই পরমা সুন্দরী লক্ষ্মীসদৃশী। ইহা ব্যতীত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের আর একটী কন্যা আছে, এসকলগুলিই রাধারাণীর যত্নে ক্রমে

বড় হইতেছে।

ঠাকুরদাস কোন দিনই সংসারের প্রতি সেরূপ আসক্ত নহেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠদ্বয় সংসারে যাহা করিতেন তাহাই হইত। তিনি দিবসে সিদ্ধবাবার নিকট এবং নিশীথে বিল্বমূলে সেই বৃদ্ধ মহাপুরুষের নিকটেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু আজ তিন দিবস হইল সিদ্ধবাবা পঞ্চবটীমূল হইতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। গ্রামবাসী ভক্তগণ চারিদিকে তাঁহার কতই অনুসন্ধান করিতেছেন। কোথাও বাবার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না ঠাকুরদাসও তাঁহার অভাবে এ কয়দিন সমস্ত দিবাভাগে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়া থাকেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধব, সন্ন্যাসীচরণ প্রভৃতি সকলেই সেই স্থানে বসিয়া সিদ্ধবাবার সম্বন্ধে কত কথাই আলোচনা করেন, সকলেরই যেন বিমর্ষ ভাব। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ভৈরবী মা, শেষ সিদ্ধবাবার এরূপ অদর্শনে তাঁহাদের চিত্ত অতিশয় বিচলিত হইল। বিশেষ ঠাকুরদাস যেন নিতান্তই চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। এতদিন সংসারের সহিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রাখিয়াও তাঁহাদের সহবাসে তিনি যে আনন্দ যে সচ্ছন্দ উপভোগ করিতেন, এখন অকস্মাৎ তাঁহার যেন সে সমস্ত ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি গভীর নিদ্রার পর যেন সহসা জাগিয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসীচরণকে গোপনে বলিলেন—"আমি কিছু দিনের জন্য তীর্থ-যাত্রা করিব মনে করিতেছি কি বল?" সন্ন্যাসীচরণ সে কথা শুনিয়া আনন্দে একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন। যে কথা সেই কাজ, তখনই দিনস্থির হইয়া গেল, কালই প্রত্যূষে বাহির হওয়া যাইবে। ক্রমে কালীচরণ, চিন্তামণিও একথা জানিতে পারিলেন।

তাঁহারাও সহযাত্রী হইতে চাহিলেন। তাঁহাদের এ পরামর্শ অবশ্য গোপনেই হইয়াছিল, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ তাহা জানিতে পারেন নাই। সেদিন সন্ধ্যার পরই ঠাকুরদাস বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, সমস্ত রাত্রিই তিনি নিম্বমূলে সেই মহাপুরুষের নিকট কাটাইয়াছিলেন। তীর্থ-যাত্রা সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে সবিশেষ উপদেশ গ্রহণকরাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শেষ রাত্রিতে যখন বাটীতে ফিরিলেন, তখন একবার মনে করিলেন, রাধারাণীকে যাইবার কথা বলিয়া যাইবেন। কিন্তু রাধারাণী সে সময় বরাহনগরের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না। প্রায় তিন মাস হইল তিনি তাহার মাতুলালয়ে প্রসব হইতে গিয়াছেন। বেদান্তবাগীশ ও চূড়ামণিমহাশয়ের একান্ত অনুরোধে ঠাকুরদাস শীঘ্রই একবার নবপ্রসূতা কন্যাকে দেখিতে যাইবেন বলিয়াছিলেন। আজ সেই কথা বলিয়াই তিনি জ্যেষ্ঠদ্বয়ের চরণে প্রণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং পূর্ব্ব পরামর্শ মত প্রত্যুষে চারিজনে ঘাটে আসিয়া নৌকারোহন করিলেন ও দুর্গা দুর্গা বলিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সকলে মনে করিলেন, সন্ন্যাসীচরণ প্রভৃতি ঠাকুরদাসের পরম বন্ধু, সেই কারণ সকলে একত্রেই বেড়াইতে গিয়াছেন। কিন্তু সত্য কখনই ত গোপন থাকে না! ক্রমে সংবাদ চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল, ঠাকুরদাস বন্ধুবান্ধব সহ কন্যা দর্শনে যান নাই, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা তীর্থযাত্রা করিয়াছেন। আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাদের এরূপ আচরণে একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। কারণ একথা ঘুণাক্ষরেও কেহ ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারেন নাই।

যথাসময়ে শ্রীমতী রাধারাণীর নিকটও এ সংবাদ পৌঁছিল,

কিন্তু তিনি তাহাতে বিস্মিত হইলেন না, তবে এইমাত্র একটু দুঃখিত হইলেন—যে, যাইবার পূর্ব্বে তিনি কোন সংবাদ দিয়া যাইলেন না। তিনি তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পাইলেন না। রাধারাণী বিলক্ষণরূপেই জানিতেন যে, তাঁহার স্বামী এ মায়ার শৃঙ্খলে চিরদিন আবদ্ধ থাকিবার পাত্র নহেন। পাখী এবার অবসর বুঝিয়া শিকলী কাটীয়া পলাইয়াছে। আবার কতদিন পরে দেখা হইবে, কবে তিনি ফিরিয়া আসিবেন, এই সব কথাই তিনি আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন। কখন কখন তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষে এ সম্বন্ধে যে কোন কথা হইত না তাহা নহে। ঠাকুরদাস তাঁহার স্ত্রীকে প্রায় বলিতেন—"তোমার আর বৃথা চিন্তা করা উচিত নহে, তোমার খেলার ঘর কল্লাত পাতিয়া দিয়াছি, তুমি এদের লইয়া আনন্দে থাক, আর ঠাকুরের অর্চ্চনা কর, ঠাকুর তোমার সকল আশা পূর্ণ করিবেন।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া রাধারাণী তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেন, কিন্তু তাঁহার মনে মনে কি হইত, তাহা ঠাকুরই জানেন!

নবম পরিচ্ছেদ।

নিরুদ্দেশ।

ঠাকুরদাস প্রভৃতি তীর্থদর্শনে বহির্গত হইয়া প্রথমেই কালীঘাটে আসিয়া আদিগঙ্গায় স্নান ও শ্রীশ্রীকালীমাতার দর্শন করিলেন। তথায় ভট্টপল্লীনিবাসী একটী ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত তাঁহাদের

পরিচয় হয়, তিনিও তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া যাইলেন। পাঁচজনের পাঁচটী প্রাণ যেন এক করিয়া তাঁহারা এখন বেশপরিবর্ত্তন করিতে বসিলেন। তাঁহাদের বস্ত্র ও উত্তরীয়াদি গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত করিয়া লইলেন, কপাল বিভূতি-চর্চ্চিত করিয়া তাহার মধ্যে সিন্দুরের তিলক দিলেন, স্কন্ধে এক একটী গৈরিক ঝুলি, তাহাতে স্ব স্ব পাঠ্য পুঁথী ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলি রাখিলেন, হস্তে যষ্টি ও কমণ্ডলু ধারণ করিলেন। সকলেই নবীন সন্ন্যাসী, সে এক অপূর্ব্ব রূপ। পথের লোক তাহাদের দেখিয়া কেহই সহজে নয়ন ফিরাইতে পারেন না, সকলেই তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল।

তাঁহারা কলিকাতার পারঘাটায় গঙ্গা পার হইয়া বারাণসীর পথে পশ্চিমাভিমুখে পদব্রজে রওনা হইলেন। ক্রমে নানা তীর্থে দেবালয় ও সাধুমুনির আশ্রম প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে করিতে প্রায় আটমাস পরে চৈত্রমাসে তাঁহারা হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ স্থানের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া তাঁহারা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইলেন; পাঁচজনেই একমত হইয়া স্থির করিলেন, এখানে কিছুদিন অবস্থান করিতে হইবে। তাঁহারা গঙ্গার ধারে একটী মন্দিরের পার্শ্বে কুটীর বাঁধিয়া তথায় ধুনি জ্বালাইয়া বসিলেন। এখন হরিদ্বার যেরূপ সহরের মত হইয়াছে, তখন ঠিক এরূপ ছিল না, অধিকাংশ স্থলই পার্ব্বত্যতরুলতায় বনাকীর্ণ ছিল, মধ্যে মধ্যে সাধুসজ্জনের আশ্রম ও দুই একটী প্রাচীন মঠ এবং মন্দির হরিদ্বারের সেই নির্জ্জন তপোবনশোভা রক্ষা করিত। সাধুসন্ন্যাসীরা চারিদিক হইতে অরণ্যের শুষ্ক কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ধুনি জ্বালিয়া বসিতেন, তাহাতে তাঁহাদের অনেক

সুবিধা ছিল,—পাককার্য্য, ধুমপান, শীতে অগ্নি সেবা এবং নিশায় হিংস্রজন্তুদিগের উপদ্রব হইতে নির্ব্বিঘ্নে সাধন, ভজন, বিশ্রাম ও নিদ্রা যাইতে পাইতেন। ঠাকুরদাস প্রভৃতিও সেইরূপ ধূনির পার্শ্বে বসিয়া পরস্পর শাস্ত্রালোচনা করিতেন, কখন ভজন-সংগীত গাহিতেন, কখন বা কাষ্ঠাহরণে বনের মধ্যে বিচরণ করিতেন, আর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন।

গঙ্গার উভয় পারেই অত্যুচ্চ হরিদ্বর্ণ তরুলতাসমাচ্ছন্ন পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার মধ্যে মধ্যে সূর্য্য, শিব, কালী, চণ্ডী ও অঞ্জনাদি নানা দেবদেবীর পবিত্র প্রাচীন মন্দির, পর্ব্বতগাত্রে যাতায়াতের আঁকা বাঁকা বিচিত্র পথ, যথার্থই নয়ন-মন-তৃপ্তিকর। পূতপ্রবাহিণী গঙ্গা যেন শঙ্কর-জটাজুট ভেদ করিয়া সপ্ত ধারায় সপ্তমুখী হইয়া কল্-কল্ রবে ভূতলে অবতরণ করিতেছেন। আহা, সে কি অপূর্ব্ব শোভা! নির্ম্মল সলিলা পতিত-পাবনী মা আমার পাপতাপক্লিষ্ট মানবের সকল পাপ-কালিমা ধৌত করিয়া অমল-শান্তি প্রদানের জন্যই বুঝি কত বাধা কত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এই ধরাধামে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই কমল পাদস্পর্শে বসুমতী চিরতরে ধন্যা হইয়াছেন। সেই কোন্ অতীত যুগে মা তাঁর পিতৃরাজ্যের এই দ্বার দিয়াই ধরায় প্রবেশ করিযাছিলেন বলিয়া আর্য্যাবর্ত্তের চিরবরেণ্য ঋষিমুনিগণ তাহার স্মৃতি-গৌরব রক্ষার মানসে সেই প্রাচীন কাল হইতেই এই পবিত্রভূমিকে "গঙ্গাদ্বার" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পুরাণাদির মধ্যে গঙ্গাদ্বার শব্দই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। হরদ্বার বা হরিদ্বার শব্দ পরবর্ত্তী সময়ে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শুনা যায় মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের দ্বারা "মায়াপুর" নাম, প্রদত্ত

হইয়াছিল, মুসলমান আধিপত্য সময়েও নাম পরিবর্ত্তনের যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তীর্থ-পুরোহিত পাণ্ডাগণের কৃপায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। নিতান্ত লোভী, নিরক্ষর ও পতিত হইলেও তাঁহাদের গোত্র-প্রবর-কর্ত্তা ঋষি-মুনি প্রদত্ত গঙ্গাদ্বার নাম এখনও তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, এখনও তাঁহারা তীর্থযাত্রীদিগের স্নানাদি সঙ্কল্প-মন্ত্রে সেই প্রাচীন নামই উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক ঠাকুরদাস প্রভৃতি এখানে নিত্য গঙ্গাস্নান ও সাধন-ভজনে বেশ আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এখানে থাকিবার সময় তাঁহারা নিকটবর্ত্তী বহুতীর্থ ও দেবালয় সমুদায় দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রসিদ্ধ কনখল্ তীর্থ—সেই প্রাচীন দক্ষযজ্ঞক্ষেত্র দর্শন করিলেন, তথা হইতে গঙ্গার পর পারে গভীর অরণ্য মধ্যে একটী গুপ্ত তপো-বনের সন্ধান পাইয়া তথায় গমন করিলেন। সাধারণ যাত্রীগণ সেস্থলে কিছুতেই যাইতে সাহস করেন না। তাঁহারা সেই তপোবনের অপূর্ব্ব শান্তি ও পবিত্রতা দর্শনে এতই বিমোহিত হইলেন যে, সেস্থানে কিয়দ্দিবস বাস না করিয়া তাঁহারা থাকিতে পারিলেন না। আরও আনন্দের কথা, সে সময় সেই পূত তপোবনে কতিপয় সিদ্ধসাধক তাঁহাদের শিষ্যবর্গকে রীতিমত শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করিতেন। ঠাকুরদাস প্রভৃতি তাঁহাদের দেবোপম আচরণ ও নির্জ্জন তপোবন-বাস দেখিয়া ক্রমেই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। বাস্তবিক সে অনুপম পবিত্রতা একালে কদাচ পরিলক্ষিত হয়। এখানে বন্য পশু পক্ষী সতত নির্ভয়ে বিচরণ করে, হিংসা, দ্বেষ বা শঙ্কা তাহাদের যেন কিছুই নাই! বনচারী মৃগকুল যখন তখন অসঙ্কোচে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়ায়, তাঁহারা আদর যত্ন করিলে কিয়ৎক্ষণ তাহাদের পানে চাহিয়া থাকিয়া আবার আপন মনে অন্যত্র চলিয়া যায়। কত বিচিত্র বিহঙ্গম চারিদিকে আপন মনে গান করে, পার্শ্বে পার্শ্বে নির্ভয়ে বিচরণ করে, খাবার দিলে হস্ত হইতেই খাইয়া যায়, যেন সব তাহাদেরই যত্নে লালিত পালিত, তাঁহাদের নিতান্ত পরিচিত। তাঁহারা এই কয়মাস অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এমনটী কোথাও দেখেন নাই, কাজেই এমন পবিত্র ভূমি তাহারা কি সহসা পরিত্যাগ করিতে পারেন? সেই তপোবনের সাধুদিগের সহিত তাঁহারা বেশ মিলিয়া যাইলেন, তাহাদের যত্নে ও উপদেশে বেশ আনন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

বৈশাখ মাস যায় যায়, এখন উত্তরাখণ্ডে পরিভ্রমণের উপযুক্ত সময়, তপোবনের কয়েকটী সন্ন্যাসী সেই উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। ঠাকুরদাস প্রভৃতিও তাঁহাদের সহযাত্রী হইলেন। পথে আরও অনেক যাত্রী জুটিয়া গেল, বেশ আনন্দে হিমালয়ের নিত্য নব নব শোভা দেখিতে দেখিতে কত উচ্চ অনুচ্চ পর্ব্বত-মালা অতিক্রম করিতে করিতে তাঁহারা চলিলেন। কতক আগে কতক পশ্চাতে যাত্রীগণ দলে দলে চলিতেছেন, একটী পাহাড়ের বাঁকের মুখে সহসা কে যেন পশ্চাৎ হইতে অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন—"ঠাকুরদাস"। ডাক শুনিয়াই ঠাকুরদাস মুখ ফিরাইলেন, আর সকলে সে কথায় বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে চলিতে লাগিলেন। তিনি ফিরিয়া যাঁহাকে দেখিলেন, তাঁহার হস্ত-সঞ্চালন, আহ্বান ও আর কি এক গুপ্ত সঙ্কেত দর্শনে নীরবে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। এদিকে সন্ন্যাসীচরণ প্রভৃতি

কিয়দ্দূর যাইবার পর ফিরিয়া দেখিলেন, ঠাকুরদাস তাঁহাদের সঙ্গে নাই, তাঁহারা এদিক ওদিক দেখিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিলেন, কিন্তু কোনও সাড়া শব্দ পাইলেন না, তাহাতে তাহারা একটু বিস্মিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ও পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, নিকটে কোন আশ্রয়স্থল না দেখিয়া সকলেই একটু দ্রুতভাবে পথ চলিতেছিলেন, সেই কারণ ঠাকুরদাসের প্রতি সে আহ্বানবাণী শুনিয়াও কেহ তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। তাঁহারা সহজেই মনে করিয়াছিলেন, সঙ্গীদের মধ্যেই কেহ হয়ত তাঁহাকে ডাকিয়া থাকিবেন। সন্ন্যাসীচরণ প্রভৃতি বহু অনুসন্ধানেও যখন তাঁহার কোনরূপ সন্ধান পাইলেন না, তখন তাঁহারা যথার্থই বিচলিত হইয়া উঠিলেন। এদিকে অন্যান্য যাত্রী সকলেই তাঁহাদিগকে ফেলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় তাঁহারা কি যে করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া যেন হতভম্ব হইয়া এক যায়গায় বসিয়া পড়িলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, তাঁহারা অগত্যা পার্শ্ববর্ত্তী অরণ্য হইতে কাঠ কুঠা কিছু সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালিয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন, ঠাকুরদাস কোথায় গেলেন, কেবল এই ভাবনা ও আলোচনাতেই মনের দুঃখে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল। প্রভাত হইলে সকলে পরামর্শ করিয়া এক এক জন এক এক দিকে তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। সমস্ত দিবস তাঁহারা নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত, অরণ্য তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সন্ধ্যার সময় অতি উৎকণ্ঠিত চিত্তে ক্লান্তদেহে একে একে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কাহারই

মুখে কথা নাই, সকলেরই মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, হতাশ প্রাণে কেবল পরস্পরে পরস্পরের দিকে চাহিতে লাগিলেন, নয়নধারায় সন্ন্যাসীচরণের বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, কালীচরণ ও চিন্তামণি ত পাগলের মত হইয়া গিয়াছে, আর সেই ভট্টপল্লীর ব্রাহ্মণযুবক, নবপরিচিত হইলেও, কয়েক মাসের একত্র সহবাসে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন, ঠাকুরদাসের সহসা এরূপ অন্তর্দ্ধানে তিনিও যে ভীষণ মর্ম্মাহত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার মুখ দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। সমস্ত দিবস কাহারও আহার নাই, পূর্ব্বঃ রাত্রি হইতে নিদ্রা ত নাহই, সকলেই নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কয়েকটী সাধু যাত্রী তাহাদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া সেইস্থানে বসিলেন ও তাঁহাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, পরে নানা কথায় প্রবোধ দিয়া তাঁহারা বলিলেন—"আহা, কাল হইতে আপনাদের আহার নিদ্রা নাই, এমনভাবে বসিয়া থাকিয়া কি করিবেন বলুন, আপনারা মুখে হাতে একটু জল দিন। তাঁহাদের নিকট কমণ্ডলুতে জল ছিল, এক জনের নিকট কিছু ভেলি গুড় ছিল, দিলেন। সকলের যত্ন ও অনুরোধে তাঁহারা বাধ্য হইয়া মুখে একটু একটু জল দিলেন, কিন্তু ঠাকুরদাস-বিহনে তাঁহাদের যে অবস্থা তাহাতে কি আর মুখে হাত উঠে, তাঁহাদের মেরুদণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সাধু যাত্রীগণ আরও কত বুঝাইলেন, বলিলেন—"আপনাদের মুখে যেরূপ শুনিতেছি, তাহাতে তিনি ত মহাপুরুষ, "নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কর্ম্মানুরোধে তিনি স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার কোনই অমঙ্গল হইবে না, সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের সহিত পুনর্বার তাঁহার

সাক্ষাৎ হইবে। আপনারা ত নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, তিনি এ প্রদেশে নাই, সুতরাং এখানে এমনভাবে আর বসিয়া থাকিয়া কি করিবেন? আমাদের সঙ্গে চলুন, এখনও একটু দ্রুতভাবে না চলিলে আশ্রয় পাইবেন না, সকল যাত্রীই চলিয়া গিয়াছে, দেখিতেছেন না, আমাদের পিছনে আর কেহই নাই।

সাধুদিগের পুনঃ পুনঃ প্রবোধবাক্য ও অনুরোধে তাঁহারা আর কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া অগত্যা কাতর প্রাণে উঠিলেন, কিন্তু পা যেন আর চলিতে চায় না, ঠাকুরদাসকে ফেলিয়া তাঁহারা কোথায় যাইবেন? অবশেষে ঠিক কলের পুতুলের মত তাঁহাদের আহ্বানে তাঁহাদের সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদা ঠাকুরদাসের অন্তর্দ্ধানের ভাবনাই ভাবিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

অবরোধ।

তখন সন্ধ্যা তেমন ঘনাইয়া আসে নাই, দূরের মানুষ তখনও বেশ চেনা যায়, ঠাকুরদাস দেখিলেন,—একটী অতিবৃদ্ধ অপরিচিত সাধু তাঁহার নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছেন। "এমন স্থানে কে ইনি, আমার নামই বা কেমন করিয়া জানিলেন?" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার ইঙ্গিত মত পার্শ্বের একটি "পাক দণ্ডী" পাহাড়ী পথ দিয়া নামিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অনতিদূরে বৃদ্ধ একটী পর্ব্বতগুহার সঙ্কীর্ণ পথ দেখাইয়া

তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন, ঠাকুরদাসও বিনা বাক্যব্যয়ে অসঙ্কোচে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধও একবার এদিক ওদিক দেখিয়া আবার বলিলেন "দাঁড়াও, আলো জ্বালি, ভিতরে ভারি অন্ধকার।" পার্শ্বেই আলো জ্বালিবার সব সাজ সরঞ্জাম ঠিক ছিল, তিনি চকমকি ঠুকিয়া আলো জ্বালিলেন, অনন্তর প্রদীপহস্তে অগ্রসর হইয়া ঠাকুরদাসকে পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন ও বলিলেন,—"ঠাকুরদাস, তুমি হয়ত একটু বিস্মিত হইয়াছ, আমাকে অপরিচিত ভাবিয়া এরূপ স্থলে বোধ হয় একটু ভীত হইয়াছ। কিন্তু কোনও ভয় নাই, ভাই! আমিও তোমার মত সেই ঠাকুরদাসের দাস, তাঁহারই আদেশে আমি এখানে বহুকাল অবস্থান করিতেছি, পরে সব কথা জানিতে পারিবে, চল একটু বিশ্রাম করিবে চল।"

ঠাকুরদাস বহুকাল পরে এমন নিভৃত স্থানে তাঁহার ঠাকুরের কথা শুনিয়া একাধারে যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হইলেন ও মনে মনে ঠাকুরকে ধ্যান করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃই অত্যন্ত সাহসী ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক, সুতরাং সাধারণের ন্যায় ভীতি পরায়ণ নহেন। তিনি বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া একটী বিস্তৃত গৃহের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই তথায় দীপ জ্বলিতেছিল, তিনি দেখিলেন সম্মুখে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে আর একখানি আসন জড়ান রহিয়াছে, বৃদ্ধের আদেশ মত সেই আসনখানি পাতিয়া তাহাতেই উপবেশন করিলেন, বৃদ্ধ সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইলেন। গুহার মধ্যের এমন গভীর নিস্তব্ধতা ঠাকুরদাস ইতিপূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করেন

নাই, এমন পার্ব্বত্য গুহাও কখন পরিদর্শন করিবার সুযোগ পান নাই, তিনি এই সব বিষয় ভাবিতেছেন, আর ঠাকুরকে স্মরণ করিতেছেন। বৃদ্ধ বলিলেন—"দেখ, ঐখানে কমণ্ডলুতে জল আছে, বাহিরে মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া এই স্থানেই একটু বিশ্রাম কর, আমি ঠাকুরের প্রসাদ লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি ভিন্ন পথে অন্যত্র চলিয়া যাইলেন।

গুহা গৃহটী বেশ প্রশস্ত, বোধ হয় প্রায় বার হাত দীর্ঘ হইবে, প্রস্থও প্রায় আট হাত হইবে। উহার তিন দিকে তিনটী দ্বার আছে, পিছনের দিকে কোন দ্বার নাই, সে দিকে কয়েকটী আলমারির মত তাক্, সে সমস্তই পর্ব্বতের গাত্রে খুদিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। দেওয়াল, ছাদ সমস্তই পাথর। তাকের মধ্যে বহু সংখ্যক পুঁথী পুস্তক রহিয়াছে, এক কোনে কতকগুলি শুষ্ক ফুল বিল্বপত্র রহিয়াছে, আর এক পার্শ্বে কয়েকখানি গৈরিক উত্তরীয় ও কম্বল রহিয়াছে, ঠাকুরদাস চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া তাহাই দেখিতে লাগিলেন, আর কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ক্রমে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, বৃদ্ধেরও দেখা নাই, কাজেই একা বসিয়া বসিয়া নানা ভাবনাই ভাবিতেছেন, সঙ্গীদের বিষয়ও ভাবিতেছেন "তাহারা সব এখন কোথায়? আমাকে দেখিতে না পাইয়া না জানি তাহারা এতক্ষণ কতই ভাবিতেছে, আমি ত তাহাদের কোন কথাই বলিয়া আসি নাই, হয়ত তাহারা এখনও সেই স্থানে দাঁড়াইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, যদি তাহারা যাত্রীদের সঙ্গে চলিয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী কোন আশ্রয়ে পৌছিয়া থাকে, তাহা হইলেই ভাল, নচেৎ তাহাদের ভারি কষ্ট হইবে।" এমন সময় বৃদ্ধ একখানি পাত্রে

কিছু আহার্য্য সামগ্রী ও একটী কমণ্ডলুতে দুগ্ধ লইয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন "আমার একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, তুমি হয়ত এতক্ষণ কত কি ভাবিতেছিলে।" ঠাকুরদাস বলিলেন—"না সঙ্গীদের ত কোন কথা বলিয়া আসি নাই, তাহারা এতক্ষণ কতদূর যাইল, আমার অদর্শনে হয়ত তাহারা খুব চিন্তিত হইয়া থাকিবে, এই সবই ভাবিতেছিলাম।"

বৃদ্ধ—"তাহারা ত একটু চিন্তিত হইবেই, সে জন্য তুমি কোনও ভাবনা করিওনা, তাহারা আজ না হউক কাল নিশ্চয়ই যাত্রীদিগের সঙ্গে চলিয়া যাইবে, এ পথে এমন ঘটনা প্রায়ই হয়। আমি ঠাকুরের আদেশ পাইয়াই তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, সমস্তই পরে জানিতে পারিবে, এখন একটু দুধ খাও আর ঐ পাত্রে যাহা আছে একটু মুখে দাও।"

পুনঃ পুনঃ ঠাকুরের আদেশ শুনিয়া ঠাকুরদাস আর কোনও কথা না বলিয়া বৃদ্ধের সকল আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিতে লাগিলেন। উভয়ে জলযোগের পর সেই গুহাতে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। সে রাত্রি আর বিশেষ কোনও কথাবার্ত্তা হইল না।

প্রাতঃকালে ঠাকুরদাস দেখিলেন, গুহার মধ্যে প্রভাতী আলোকপ্রভা দেখা দিয়াছে, বৃদ্ধ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—"চল স্নান করিয়া আসি।" ঠাকুরদাস তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ভিন্ন পথে গুহার বাহিরে পাকদণ্ডী পথে নিম্নে কিয়দ্দূর যাইয়া গঙ্গা-স্নানাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলেন, আসিবার সময় অরণ্য হইতে প্রয়োজনমত ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। পুনরায় গুহার প্রবেশপথে দেখিলেন একটী অপরিচিত পাহাড়ী লোক একটী লাউএর তুম্বায় কিছু সিধা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে,

বৃদ্ধকে দেখিয়াই প্রণাম করিল ও গুহাদ্বারে তাহা রাখিয়া হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ গুহামধ্য হইতে আর একটী সেইরূপ লাউয়ের খোলা আনিয়া সে গুলি ঢালিয়া লইলেন। সেই অপরিচিত লোকটী তাহার খালি পাত্র লইয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ঠাকুরদাস বৃদ্ধের সহিত পুনরায় গুহার পথে প্রবেশ করিলেন। এখন গুহার মধ্যেও বেশ আলোক আসিয়াছে। তিনি দেখিলেন, স্থানটী অত্যন্ত মনোরম, কাল সন্ধ্যার সময় যে পথ দিয়া এখানে আসিয়াছিলেন এটী সে পথ নহে, এখান হইতে গঙ্গায় নামিবার পথ বেশ সরল ও অল্প, উপর হইতে গঙ্গার খরতর প্রবাহ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরে চতুর্দ্দিকে নানা ফল ফুলের গাছ, নানা জাতীয় বিহঙ্গগণ শাখায় বসিয়া সর্ব্বদা কলরব করিতেছে। ভিতরে সম্মুখেই একটী মন্দির, সিন্দুরলিপ্ত কয়েকটী দেবমূর্ত্তি তাহার মধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। মূর্ত্তিগুলি এত প্রাচীন ও সিন্দুর চন্দনে এমনভাবে ঢাকিয়া গিয়াছে যে, তাঁহাদের চোক, মুখ, হাত, পা, কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ঠাকুরদাস, কাল এ গৃহে আসেন নাই, ইহার দুই পার্শ্বে এইরূপ আর দুইটী গুহা আছে, তাহার মধ্যে বাম পার্শ্বের গুহাটীতেই তাঁহারা রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, দক্ষিণদিকের গুহাটী পাককার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। সকল গুহার মধ্য হইতেই স্বতন্ত্র পথে বাহিরে যাইতে পারা যায়। বৃদ্ধ ঠাকুরদাসকে পূজা করিতে বলিলেন। সেই সঙ্গে দেবমূর্ত্তি-গুলির পরিচয় দিয়া বলিলেন—"দেখ, এই সম্মুখের মূর্ত্তিটী গুহ্যকালী দেবী, পার্শ্বে ইনি শিব, আর এদিকে বদ্রিনারায়ণ রহিয়াছেন। মন্দিরটী অতি প্রাচীন তাহা দেখিতেই পাইতেছ,

আমি এখানে অনেকদিন আছি, আমারও সময় হইয়াছে, ঠাকুরের আদেশ না পাইলে ত যাইতে পারি না। সে দিন ঠাকুর তোমার নাম করিয়া বলিলেন—সে আসিবে, তুমি তাহাকে ডাকিয়া লইও, আমার না আসা পর্য্যন্ত সে যেন এখানে থাকে যাহা হউক ভাই, ক্রমে বেলা হইতেছে, তুমি এখন পূজা কর।"

ঠাকুরদাস বৃদ্ধের আদেশ মত পূজার সমস্ত আয়োজন করিয়া পূজা করিতে বসিলেন। দেবমূর্ত্তিগুলির পুরাতন সিন্দুর চন্দন তুলিয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন, তাহাতে মূর্ত্তিগুলির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জীর্ণ হইলেও অনেকটা বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর তিনি পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পূজার ব্যবস্থা ও রীতি নীতি দেখিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়া, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে পাকাদি সমাপন করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিলেন ও উভয়ে আশীর্ব্বাদ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাসকে নিকটে বসাইয়া তিনি মন্দিরের পরিচালনা সম্বন্ধে বলিলেন—"প্রত্যহ প্রাতঃকালে এখানে রাজার প্রদত্ত সিধা আসে, তাহাত তুমি দেখিয়াছ, সন্ধ্যার সময় দুধ ও অন্যান্য জল খাবার যেদিন যেমন হয় আসে। রাজা অত্যন্ত ভক্তিমান্ পুরুষ, সাধু সন্ন্যাসীদিগের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা, কোথায় নির্জ্জনে কোন গুহার মধ্যে কোন্ সাধু যোগরত, প্রত্যহ তাহার অনুসন্ধান করিয়া তিনি তাঁহাদের আহার্য্য পাঠাইয়া দেন। এদেশের প্রত্যেক পাহাড়ের মধ্যে এমন গুপ্তগুহা অনেক আছে, সাধুরা আসিয়া তথায় নির্ব্বিঘ্নে সাধন ভজন করিয়া থাকেন। দেশের লোকও এত সরল ও ধর্ম্মপরায়ণ যে তাহারা সাধুসন্ন্যাসীকে যেন সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়াই মনে করে। তাহারা মাঝে মাঝে

সাধুদের জন্য কত কি পাঠাইয়া দেয়। অধিক হইলে আমি সাধুসন্ন্যাসী যাত্রীদের ডাকিয়া আনিয়া তাহা বিতরণ করিয়া দিই। ঠাকুর বলিয়াছেন—"তুমি এখন কিছুদিন এইখানেই থাক, তাঁহার না আসা পর্য্যন্ত তুমি কোথাও যাইও না। এই দেখ, এখানে কত গুপ্ত সাধন শাস্ত্র আছে অবসর মত এই সকল বেশ আলোচনা করিতে পারিবে।"

অপরাহ্ণ সময়ে বৃদ্ধ বাহিরে যাইলেন, ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল, ঠাকুরদাস সায়ংসন্ধ্যা করিবার মানসে মুখ হাত ধুইবার জন্য গুহার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, সেই পাহাড়ী লোকটী একটী ঘটীতে দুধ ও ভিন্ন পাত্রে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে ব্যক্তি প্রণাম করিল, ঠাকুরদাস ভিতর হইতে কমণ্ডলু ও একখানি পাত্র আনিয়া সেগুলি আজাড় করিয়া লইলে, লোকটী প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তিনি মন্দিরে আসিয়া দেবতার উদ্দেশে তাহা উৎসর্গ করিয়া দিলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, বৃদ্ধের আর দেখা নাই, এই আসেন এই আসেন করিয়া তিনি মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহার অপেক্ষা করিলেন, পরে নিজে জলযোগ করিয়া শয়ন করিলেন। বৃদ্ধ আর আসিলেন না, তিনি অবসর বুঝিয়া প্রকারান্তরে ঠাকুরদাসের উপর মন্দির ও গুহার ভার দিয়া বোধ হয় একবারে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরদাস বৃদ্ধের প্রমুখাত তাঁহার ঠাকুরের আদেশবাণী শুনিয়া সেই স্থানেই এখন আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার এ অবরোধ কবে যে মুক্ত হইবে, তাহা পূজ্যপাদ ঠাকুরই জানেন!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্বেষণ।

সন্ন্যাসীচরণ প্রভৃতি ঠাকুরদাসের অভাবে কাতর ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া যাত্রীদিগের অনুরোধে পরবর্ত্তী চটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও যৎসামান্য জলযোগ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা আর বাহির হইলেন না, সেই চটীতেই পাকশাক করিয়া আহারাদি করিলেন, বিশ্রামান্তে অপরাহ্নে যাত্রীদিগের সহিত পুনরায় যাত্রা করিলেন, কিন্তু ঠাকুরদাসের অভাবে তাঁহাদের আর সুখ বোধ হইল না। তাঁহারা যথাসময়ে উত্তরাখণ্ড হিমগিরি পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় সমতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বর্ষা ঋতু আরম্ভ হইয়াছে, হিমালয়ের তরাইভূমি এসময় আদৌ স্বাস্থ্যকর থাকে না। কালীচরণ সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায়, চিন্তামণি প্রভৃতি তাহাতে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ও তাঁহারা যত সত্বর পারেন তথা হইতে চলিয়া আসলেন। কালীচরণ সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে না হইতেই চিন্তামণিও রুগ্ন হইয়া পড়িলেন! সন্ন্যাসীচরণ প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাঁহাদিগকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন ও ভট্টপল্লীর সেই ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত তাঁহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারাও কয়েকদিন বিদেশে রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য একটু ব্যস্তও হইয়াছিলেন, সুতরাং সন্ন্যাসীচরণের প্রস্তাবে তাঁহারা অমত না করিয়া আনন্দিতচিত্তে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সন্ন্যাসীচরণ এখন একাই তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ, ঠাকুরদাসের অনুসন্ধানে পুনরায় বাহির হইলেন। এদিকে কালীচরণ প্রভৃতি যথাসময়ে দেশে ফিরিয়া আসিলে গ্রামস্থ সকলেই তাঁহাদের বিষয় অবগত হইলেন, কিন্তু ঠাকুরদাস ও সন্ন্যাসীচরণকে না দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, বিশেষ ঠাকুরদাসের সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বেদান্তবাগীশ মহাশয় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীচরণ সবেমাত্র বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সংসারে জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ভগিনীপতি ও একটী ছোট ভাগিনেয় ব্যতীত আর কেহই ছিল না, স্ত্রী তখন তাহার পিত্রালয়েই ছিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বামী-পুত্রসহ তাঁহার ভাইয়ের অভিভাবক রূপে ভাইয়ের সংসারেই থাকিতেন, তাঁহার স্বামীর অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। সন্ন্যাসীচরণ আর আসিবেন না শুনিয়া তিনি বাহ্যিক একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেও মনে মনে খুবই আনন্দিত হইলেন, ভাবিলেন সন্ন্যাসীর বিষয়টা তিনিই সম্পূর্ণ ভোগদখল করিতে পারিবেন। স্ত্রী অল্পবয়স্কা হইলেও স্বামীর বৈরাগ্য সংবাদ পাইয়া চিন্তিত হইলেন, মুখে কিছু প্রকাশ করিতে না পারিলেও মনের কষ্ট মনে চাপিয়া রাখিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসীচরণ সঙ্গীদের দেশে পাঠাইয়া দিয়া যেখানে তাঁহার বন্ধু ঠাকুরদাসের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ হইয়াছিল, সেইস্থানে আবার আসিলেন, মনের দুঃখে সেই পাহাড়ের ধারে পাগলের মত "ঠাকুরদাস ঠাকুরদাস" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এখন তাঁহার আর কোন চিন্তা নাই, সময়ে আহার নাই, নিদ্রা নাই, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধুর বিরহে তিনি সমস্তই শূন্যময়

দেখিতে লাগিলেন। বাস্তবিক প্রকৃত বন্ধুর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা যে কতদূর কষ্টকর, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহই অনুভব করিতে পারে না।

ঠাকুরদাস সেই নিভৃত গুপ্তগুহাতে একাই বাস করিতেছেন, কোথাও বেড়াইবার উদ্দেশে বা কোন কারণে গুহার বাহির হন না, কেবল প্রত্যহ প্রাতঃকালে একবার মাত্র সেই পাহাড়ের পিছন দিকে পাকদণ্ডী পথে যাইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসেন ও কমণ্ডলুপরিপূর্ণ জল লইয়া, আসিবার পথে বনজাত ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ করিয়া আনেন। গুহার মধ্যেই নিত্য পূজাপাঠ ও সাধন ভজন লইয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করেন। সুতরাং সন্ন্যাসী-চরণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা এখন যে কোথায়, কি করিতেছেন, কোন সংবাদই তিনি জানেন না, আর জানিবার উপায়ও নাই, কখন কখনও তিনি তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন মাত্র। এইভাবে প্রায় চারিমাস কাল অতীত হইয়া গেল। তখন বর্ষাকাল, ভাদ্রমাসের অবিশ্রান্ত বর্ষা—সাধুসন্ন্যাসীরা আর কেহ বড় বাহিরে নাই, সকলেই মঠে মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছে, গো মহিষাদি গৃহপালিত পশুদিগকে লইয়া পার্ব্বত্য বালক বালিকারা আর তেমন বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায় না; পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই মধ্যে গো-মহিষাদি সহ বসিয়া থাকে ও আপন মনে গান করে, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে বা বাদলা বৃষ্টি না হইলে কখন কখনও নিকটস্থ বন্য ফল মূল আহরণ করিয়া আনে ও পশুদিগকে চরিতে দেয়। এই সময়কে পাহাড়ীরা চাতুর্ম্মাস্য বলে। সন্ন্যাসীচরণ তাহাদেরই নিকট সেই

কুটীর মধ্যেই আজ কাল আশ্রয় লইয়াছেন, তাহদেরই যত্নে কোনরূপে দিনাতিপাত করেন ও সুবিধা মত বন্ধুর অনুসন্ধান করেন। একদিবস প্রাতে পথিপার্শ্বে তিনি সেইরূপ একটী কুটীরের ধারে দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একজন পাহাড়ী কতকগুলি কি জিনিষ লইয়া কোথায় যাইতেছিল, সন্ন্যাসীচরণকে দেখিবামাত্র দাঁড়াইয়া পরিচিত বোধে প্রণাম করিল, কিন্তু পরক্ষণেই বোধ হয় তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সে আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসীচরণের কি মনে হইল, তিনি লোকটার পিছু পিছু কিছুদূর গিয়া দূর হইতে দেখিলেন, সে এক পাকদণ্ডী পথে নামিতেছে, তিনিও তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সেই পথে নামিতে লাগিলেন। লোকটা অনেক দূর যাইয়া এক স্থানে হাঁতের সেই জিনিষগুলি নামাইয়া যেন কাহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। তিনিও কৌতুহল-পরবশ হইয়া অলক্ষ্যে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এইভাবে অধিকক্ষণ অতীত হইল না, দেখিলেন দূরে তাঁহারই মত এক নবীন সাধু আসিতেছেন, সেই পাহাড়ী লোকটী তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিল, সাধু পাহাড়ের গাত্রে এক গুহার পথে চলিয়া যাইলেন। ইতিমধ্যে সন্ন্যাসীচরণ সেই গুহাদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, সে ব্যক্তি তখনও দাঁড়াইয়া ছিল, তাঁহাকে দেখিয়া আবার প্রণাম করিল। তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে সেই সাধু এক পাত্রহস্তে বাহিরে আসিলেন। সন্ন্যাসীচরণের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল; উভয়ে আনন্দে বিস্ময়ে যেন লাফাইয়া উঠিলেন, উভয়ে উভয়কে দৃঢ় আলিঙ্গন সহ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাহারও মুখে

কথা নাই বার্ত্তা নাই, সে এক অপূর্ব্বভাবে তাঁহারা যেন আত্মহারা। সে ব্যক্তিও তাহাদের এই অপ্রত্যাশিত মিলন-আনন্দে আনন্দিত হইয়া এক পার্শ্বে হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাধু ঠাকুরদাস তখন আর কোন কথা না বলিয়া তাহার পাত্র খালি করিয়া দিয়া সন্ন্যাসীচরণের হাত ধরিয়া গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে ব্যক্তি প্রণাম করিয়া তাহার শূন্য পাত্র লইয়া চলিয়া গেল। ঠাকুরদাস সন্ন্যাসীকে পাইয়া যেন পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

তাহার পর উভয়ে উভয়পক্ষের সকল ঘটনা বলিতে লাগিলেন। চিন্তামণি প্রভৃতির দেশে প্রতিগমনের সংবাদ পাইয়া ঠাকুরদাস বলিলেন "ভালই হইয়াছে, তাহাদিগের সংসারাশ্রমের আশা পূর্ণ হয় নাই, তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়া ভালই করিয়াছ। অনন্তর সন্ন্যাসীচরণের বন্ধু প্রীতি, এতাধিক কষ্ট ও যন্ত্রণার কথা শুনিয়া একাধারে আনন্দ ও কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীচরণও তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত অবরোধবিবরণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইতে লাগিল, সন্ন্যাসীচরণ স্নান করিয়া আসিলেন, পূজাপাঠাদি সমাপন করিয়া উভয়ে আহার করিলেন। মধ্যাহ্নে উভয়ের আবার নানা বিষয়ক আলোচনা হইতে লাগিল। অনেক দিন পরে দুই বন্ধুতে একত্র বাস করিয়া বেশ সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন। গুহার মধ্যে বহু গুপ্ত সাধন-গ্রন্থ ছিল, তাঁহারা তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীচরণ কোন কোন গ্রন্থের প্রতিলিপিও করিয়া লইলেন।

এক দিবস গভীর নিশায় সন্ন্যাসীচরণ নিদ্রিত, এমন সময়ে

কে ডাকিলেন—"ঠাকুরদাস!" সহসা সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া ঠাকুরদাস একেবারে ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিলেন। কে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—"এদিকে এস।" ঠাকুরদাস বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া যন্ত্র চালিতের ন্যায় চলিলেন; কোথায় চলিলেন, তাহার ঠিকানা নাই। সেই গভীর রজনীর ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার আবার অন্তর্দ্ধান হইল। প্রভাতে সন্ন্যাসীচরণ উঠিয়া দেখেন—ঠাকুরদাস নাই. ভাবিলেন—"হয়ত শৌচাদি সম্পন্ন করিতে গিয়াছেন।" তিনিও যথারীতি স্নানাদি সম্পাদনের জন্য বাহির হইলেন। গুহাদ্বারে আসিয়া দেখিলেন—একটি সুকুমার বালক সাধুবেশে যেন তাঁহারই অপেক্ষা করিতেছেন। বালক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একখানি পত্র দিলেন। তিনি সেই পত্র পাঠ করিয়া একবারে অবাক হইয়া যাইলেন। পত্রখানি ঠাকুরদাসের লেখা, তাহাতে লিখিত ছিল,—"ভাই সন্ন্যাসী, আমি পূজ্যপাদ ষট্ শ্রীমৎ ঠাকুরের আহ্বানে চলিলাম, তুমি ইচ্ছা করিলে এখানে থাকিতে পার, অথবা এই বালকের উপর পূজার ভার দিয়া যথা ইচ্ছা এখন যাইতেও পার। ঠাকুরের আদেশে আবার সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত বলিব। তোমার স্নেহাভিলাষী ঠাকুরদাস।"

সন্ন্যাসীচরণ বালককে গুহার মধ্যে লইয়া যাইলেন, ঠাকুরদাস সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু সে বালক বিশেষ কিছুই বলিতে পারিলেন না। কেবল এইমাত্র বলিলেন—"আমি লাহোরে আমার গুরুদেবের আশ্রমে ছিলাম, সম্প্রতি তাঁহারই সঙ্গে এখানে আসিয়াছি, আজ প্রাতে গুরুদেব এই পত্র দিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার সহিত এখন আর আমার দেখা

হইবে না। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার সুবিধা হইলে এখানে আসিয়া আমায় লইয়া যাইবেন। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আপনি আদেশ করুন।” বালকটী বাঙ্গালা নহে, কথা-বার্ত্তায় পঞ্জাববাসী বলিয়াই বোধ হইল। সন্ন্যাসীচরণ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্নান করাইয়া আনিলেন ও পূজা পাঠের সমস্ত ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। কয়েক দিবস এখানে থাকিবার পর তিনি বালককে বলিলেন, “তুমি এখানে একা থাকিতে পারিবে?” বালক বলিলেন—“কেন পারিব না! গুরুজীর আদেশ—এখানে মরিয়া যাইলেও স্থান পরিত্যাগ করিব না জানিবেন।” সন্ন্যাসীচরণ তাহার গুরুভক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি তাহার উপর গুহা ও মন্দিরের ভার দিয়া পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে ঠাকুরদাস ও সন্ন্যাসীচরণ এই স্থান হইতে স্ব স্ব বাটীতে পত্র দিয়াছিলেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় সেই পত্র পাইয়া ভ্রাতার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। কিন্তু তখন এমন রেলগাড়ী হয় নাই যে, দুইদিনে পত্র পৌঁছিবে, বা দুই চারিদিনের মধ্যে বাঙ্গলাদেশ হইতে উত্তরাখণ্ডে পৌঁছান যাইবে। সুতরাং পত্র প্রাপ্তির পর বেদান্তবাগীশ মহাশয় যখন দেশ দেশান্তর প্রদক্ষিণ করিয়া বহু অনুসন্ধানে সেই গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের কাহাকেই দেখিতে পাইলেন না। তাহার প্রায় এক মাস পূর্ব্বে ঠাকুরদাস শ্রীশ্রীঠাকুরের আহ্বানে এ স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, সন্ন্যাসীচরণও আজ তিনদিন হইল পুনরায় তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। সেই বালকটীই বৃদ্ধ বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে এই সকলকথা বলিলেন ও তাঁহাকে

আদর অভ্যর্থনা করিয়া বিদায় দিলেন। বৃদ্ধ এত পরিশ্রম করিয়া এই সুদূর হিমতীর্থে আসিয়াও স্নেহের পুত্তলী কনিষ্ঠ ভ্রাতার সাক্ষাৎ না পাইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। তখন শীতঋতু সমাগত প্রায়, এ অবস্থায় তিনি বাধ্য হইয়া হিমপ্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রাতার অন্বেষনে নানা দেশ ও তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অতি কাতর দেহে দেশে ফিরিলেন। ভ্রাতৃশোকে তাঁহার শরীর মন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছিল, তিনি ঘরে ফিরিয়াও আর সুস্থ হইতে পারিলেন না। অল্পকালের মধ্যেই তিনি পরোলোক গমন করিলেন। এখন তাঁহার সংসারে একমাত্র পুরুষ অভিভাবক তাঁহার মধ্যম সহোদর শিরোমণি মহাশয় আর স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবল মাত্র রাধারাণীই রহিলেন। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। ঠাকুরদাসের কন্যাগুলির সব বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা এখন আপন আপন শ্বশুর গৃহেই বাস করিতেছেন। সুতরাং রাধারাণীর সংসারবন্ধন এখন আর তেমন দৃঢ় নাই। তিনি তাঁহার মেজ বড়্ঠাকুরের আদেশ লইয়া স্বামী অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। তীর্থে তীর্থে যে স্থানে সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম সংবাদ পাইলেন, রাধারাণী তথায় তাঁহার হৃদয়-দেবতার অনুসন্ধান করিতে ছুটিলেন—কিন্তু চারিধামের কোথাও তাঁহার সন্ধান পাইলেন না। হায় রাধারাণী, তিনি কি সাধারণ নাগা সন্ন্যাসী যে, যথায় তথায় তাঁহার অনুসন্ধান পাইবেন? রাধারাণী উপর্য্যুপরি তিনবার তাঁহার অন্বেষণ করিয়া হতাশ হইয়া গৃহে ফিরিলেন। এই সময় ভৈরবী মা সহসা কি জানি কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও তাঁহাকে সান্ত্বনা এবং

ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। রাধারাণী মহাপুরুষের উপযুক্ত গৃহিণী, তিনি ভৈরবীমার উপদেশ পাইয়া পরমানন্দে সাধন ভজন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হৃদয় দেবতাকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি তিনি আর গৃহ পরিত্যাগ করেন নাই! তিনি বলিতেন— "শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ ঠাকুরের আদেশেই ভৈরবী মা তাঁহাকে উপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন।" ভৈরবী মা তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিতা হইয়াছেন, কেহই তাহা বলিতে পারে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী চরণ।

সন্ন্যাসীচরণের এখন আর তেমন কাতরতা নাই, গুহা-মন্দির পরিত্যাগ করিয়া অবধি তীর্থে তীর্থেই তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যেখানে যত দিন ইচ্ছা থাকেন, তাঁহার আর কোন উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষা নাই, নিত্য সাধন ভজনে এখন তাঁহার হৃদয়ের বলও বেশ বৃদ্ধি হইয়াছে। ঠাকুরদাস কোথায় আছেন, আবার কতদিন পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এ চিন্তা তাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ না করিলেও তিনি তাহার জন্য আর বিচলিত নহেন। তবে কখন কখন সেই গুহামন্দিরে আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন, সেই বালক ব্রহ্মচারী সমভাবেই তাঁহার নিত্যকর্ম্ম করিয়া যাইতেছেন, ঠাকুরদাসের কোনও সংবাদ আর পান নাই।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে সুদীর্ঘ দশটী বৎসর কাটিয়া গেল, এবার সেতুবন্ধ রামেশ্বর হইতে পুরীর পথে ফিরিবার সময় তিনি গঙ্গাসাগরের মেলায় আসিলেন। তথায় বহু সাধু সজ্জনের মধ্যে ঠাকুরদাসের কোন সংবাদ পাইবার আশায় একটু অনুসন্ধানও করিলেন। একটী বৃদ্ধ সাধু তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি ঠাকুরদাসের অনুসন্ধান করিতেছ?" তিনি সহসা এরূপ কথা শুনিয়া একটু চমকিত হইলেন, তাহার পর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কি তাঁহার কোন সংবাদ জানেন?" বৃদ্ধ বলিলেন—কিছু কিছু জানি, তিনি বোধ হয় এখনও অমরকণ্টকে আছেন, ঠাকুরের আদেশে শীঘ্রই হিঙ্গলাজে যাইবেন স্থির হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে না। আরও দুই বৎসর পরে কাশীধামে তিনি তোমাকে দেখা দিবেন।" এই কয়েকটী কথা বলিয়াই বৃদ্ধ এত ব্যস্তভাবে চলিয়া যাইলেন যে, সন্ন্যাসীচরণকে আর কোন কথা বলিবার অবসর মাত্রও দিলেন না। সন্ন্যাসীচরণও তাঁহাকে তাড়াতাড়ি প্রণাম করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি যে কোথায় যাইলেন, তাহা আর দেখা গেল না। যাহা হউক দুই বৎসর পরেও যে, ঠাকুরদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, এ আশার বাণীও তাঁহাকে যথেষ্ট আনন্দ প্রদান করিল।

তিনি গঙ্গাসাগর হইয়া কলিকাতায় আসিলেন, কালীদর্শন করিলেন। জন্মভূমির এত নিকটে আসিয়া একবার মাত্র তাহা দর্শনের ইচ্ছা তাঁহাকে একটু বিচলিত করিল। তিনি গ্রামে আসিলেন, এই দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার চেহারার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মস্তকে জটাজুট, দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজী. তাহাও পিঙ্গলবর্ণ

ধারণ করিয়াছে। তিনি অনেককেই চিনিতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহাকে সহসা কেহ চিনিতে পারিল না। তিনি পরিচয় দিবার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন না। একবার মাত্র জন্মভূমি দর্শন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। তিনি একজন অপরিচিত ভিক্ষুকের বেশে নিজ জন্মভিটার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে গ্রামের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কত পুরাতন লোককে দেখিতে পাইলেন না, কত ঘর বাড়ী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আবার কত নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার নিজ ভিটারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে দেখিলেন। তাঁহার দিদি সম্মুখে আসিলেন, একবার দেখিয়াই বিস্ময়ে চকিতে মুখ ফিরাইলেন, বলিলেন,—"এখন হাতযোড়া গো, অন্য বাড়ী দেখ।" সন্ন্যাসী-চরণ সে কথায় কাণ না দিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতরের দিকে চলিলেন। দিদি তাঁহাকে ভিতরে আসিতে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"ওমা একি গো, ভিখিরি মিন্সে কথা শোনে না যে, বল্লুম এখন হাত যোড়া সে কথায় কাণ না দিয়ে আবার বাড়ীর ভেতর আসচে যে, ওরে খোকা, দেখ ত, মিন্সে ত ভারি বদমাইস্ দেখ্‌চি, দেত মিন্সেকে দূর করে দে।" বলিতে বলিতে নামে মাত্র খোকা, একটী বিশ বাইশ বৎসরের যুবক বাড়ীর মধ্য হইতে বাহির হইয়াই সাধু ভিখারীকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"ওমা, মামা এসেছেন!" আত্মীয় স্বজন যতই বেশ পরিবর্ত্তন করুন আর যত দিন পরেই আসুন, তাঁহাকে চিনিতে পারে না, এও কি কথা! ভাগিনেয় দেখিবা মাত্রই চিনিতে পারিয়া ছিল। সে আত্মীয়তার স্নেহমাখা দৃষ্টি, সে হাসি কি এড়াইবার যো আছে? দিদিও যে চিনিতে পারেন নাই,

তাহা নহে, তবে তাঁহার প্রকৃতি স্বতন্ত্রবিধ, তাই তিনি ভাইকে আসিতে দেখিয়াই চমকাইয়া গিয়াছেন, ভাইয়ের সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়া বেশ ভোগ দখল করিতেছেন, আবার সন্ন্যাসী আসিয়া সে সমস্ত আপনার করিয়া লইবে, তাহা কি সহ্য হয়! তাই তিনি আসিবামাত্রই তাঁহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। সন্ন্যাসীচরণ সরলভাবেই মনে করিলেন, হয়ত দিদি এখনও ঠিক ঠাহর করিতে পারেন নাই, সেই কারণ এইবার মুখ ফুটিয়া বলিলেন,—"দিদি, আমায় চিন্‌তে পার নাই, আমি যে সন্ন্যাসী।" দিদি তাচ্ছিল্যসহ ক্রোধ ভরে বলিলেন,—হাঁ হাঁ, বিষয় থাকলে অনেকেই সন্ন্যাসী সেজে আসে, ওরে খোকা, ও নিশ্চয় জোচ্চোর, ভারি জোচ্চোর, ওকে শিগ্‌গির করে বিদেয় কর, নইলে অনর্থ করবে দেখচি, ও পাকা বদমাইস।"

খোকা। "না মা, ইনি জোচ্চোর নন—মামা, তুমি ভাল করে দেখ।"

দিদি। "তুই ত আচ্ছা আহাম্মুখ ছেলে দেখ্‌চি? তুই ত তখন একরত্তি, তোর মামা চলে গেছে; আমি তারে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি, আমি তারে চিনিনি! এখনই বিদেয় কর্‌, ও তোর মামা নয়। কর্ত্তা কোথায় গেলেন ডাক্‌, ওমা, কি মুস্কিলে পল্লুম মা, ছেলেটাও এমন হাবাতে দেখদেখি, যাকে তাকে বলে কিনা মামা!

এইরূপ গোলমাল হইতেছে কর্ত্তা বাড়ী আসিলেন, তিনিও স্ত্রীর কথায় পোষকতা করিয়া বলিলেন,—"আরে সে কবে মরে গেছে, সে কি আবার দানা পেয়ে এল নাকি? ও খোকা, ও তোর মামা নয়, যাও বাপু এ ছেলের হাতে মোয়া নয়, এখানে

চালাকি টালাকি হবে না, সরে পড়।"

খোকা। "বাবা আপনি কি বল্‌ছেন, আপনিও মামাকে চিন্‌তে পার্‌লেন না?"

পল্লীর আরও দুই পাঁচজন লোক আসিয়া জমা হইল, যাহারা ছেলে মানুষ তাহারা চুপ করিয়া রহিল, যাঁহারা বৃদ্ধ তাঁহারা পরস্পর মুখোমুখী করিতে লাগিলেন, বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না। দুই একজন বলিলেন,—"চেহারাটা কতকটা সেই রকম বটে।" সন্ন্যাসীচরণ নির্ব্বাক, তাঁহার পরিচয় দিবার ত কোন প্রয়োজন ছিল না, তবে দিদির ব্যাপার দেখিয়া তিনি মনে মনে হাসিতে লাগিলেন, অনন্তর খোকাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"না বাপু আমি তোমার মামা নই, তুমি ভুল করেছ, হয়ত তোমার মামার চেহারা আমার মতই হবে। যাক্, এখন আমি আসি।"

খোকা। "সেকি, তা কখনই হবে না, অমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়্‌ব না, এ বিষয় ভাল করে তদন্ত কর্‌তে হবে। আমি কি এতই ছেলে মানুষ আপনি যখন চলে যান, তখন আমি বার বছরের, আপনার চেহারা আমার খুব মনে আছে। আচ্ছা আপনি যাবেন না, আমি এখনই আস্‌ছি।" এই বলিয়া খোকা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কর্ত্তা গৃহিণী ভাবিলেন,—"দেখদেখি ছেলেটা আবার কি বিপদ কর্‌লে, বেশ ভাগিয়ে দেওয়া যাচ্ছিল, বিষম গোলযোগ বাধালে দেখ্‌চি।" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আবার কোথা ছুটল, আমরা চিন্‌তে পার্‌লুম না, ও তখন কত টুকু, ও তারে চিনে রেখেছে? আর সেত মরে গেছে শুনেছি। বেদান্তবাগীশ

মহাশয় যখন ফিরে এলেন তখন ত তিনিও তার দেখা পান নি। তখন সকলে নাকি তার মরণ সংবাদই দিয়ে ছিল।"

সন্ন্যাসীচরণের মুখে না হুঁ না হাঁ। তিনি সংসারের ব্যাপার দেখিয়া যেন হতভম্ব হইয়া গিয়াছেন, সামান্ত বিষয়ের জন্ত মানুষ এতটাও করিতে পারে? তিনি নামে সন্ন্যাসী কার্য্যেও সন্ন্যাসী। বিষয় আকাজ্ক্ষা তাঁহার কিছুমাত্র নাই। তবে কৌতুহল-পরবশ হইয়া তিনি আরও কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

খোকা বাড়ী হইতে ছুটীয়া অদূরে তাঁহার মামীর পিত্রালয়ে যাইলেন. তাঁহার মামীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মামীমা মামা এসেছেন, আচ্ছা আপনি তাঁকে দেখ্‌লে চিনতে পারবেন?" মামী আনন্দে উৎসাহে বলিলেন,—"তা আর পারব না, খুব পারব, তিনি কোথায়?"

খোকা—"বাড়ীতে, আচ্ছা আপনি তাঁর কি কোন চিহ্ন জানেন।"

মামী—"তাঁর কপালে ভ্রুর উপর ফোড়া হয়েছিল, তা' অস্তর হয়, সেই অস্তরের দাগ আছে।"

খোকা—"তবে মামীমা, শিগ্‌গীর আসুন, আমার সঙ্গেই চলে আসুন, মামাকে আমি বসিয়ে রেখে এসেছি, দেরি হলে হয়ত তিনি আবার চলে যেতে পারেন।"

মামী ভাগিনেয়তে ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ীতে আসিলেন। তখনও পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে তাড়াইবার ব্যবস্থাই হইতেছিল। পাড়ার অনেক ভদ্রলোক মেয়ে ছেলেয় বাড়ী পুরিয়া গিয়াছে। প্রাচীনদের মধ্যে অনেকেই বলিলেন "হ্যাঁ সেই রকমই বটে, তবে খোকার মা বাপু, আপনার লোক যখন

বলছে নয়, তখন আর আমরা কি বল্‌ব।"

সন্ন্যাসীচরণ পূর্ব্বের ন্যায় নির্ব্বাক নিস্পন্দভাবেই বসিয়া আছেন। বাড়ীতে অনেক ভীড় দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী প্রথমেই দৌড়াইয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন, যাইবার সময় তাঁহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া যাইলেন—তাঁহাকে বেশ চিনিতে পারিলেন ও বলিলেন—"হঁা তিনিই ত বটে।"

খোকা—"তবে মামীমাও চিন্‌তে পেরেছেন; মা, তুমি মামাকে এখনও চিন্‌তে পারুলে না? তিনি আরও ক্রোধভরে বলিলেন"—"না—তা তোরা ঐ রাস্তার ভিখিরিকে নিয়েই থাক্‌গে যা—এমন হতভাগা, হতচ্ছাড়া, আহাম্মুখ ছেলেও আমার গর্ভে জন্মায়!" কর্ত্তা আর কোনও কথা না বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। খোকা তখন তাঁর মা বাপের মনোভাব ও অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিলেন, তার মা বাপ যে, তাঁহার মামাকে চিনিয়াও চিনিতে চান্ না এপর্য্যন্ত চিনিবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টাও করিলেন না, ইহা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। খোকা এখন নিতান্ত ছেলেমানুষটী নহেন, সৎ অসৎ সকল কথাই বুঝিতে পারেন, ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মামার কোন কোন সম্পত্তি তাঁহার পিতা বেনামী করিয়া রাখিয়াছেন তাহাও জানেন, আজ তাঁহাদের এরূপ নির্ম্মম আচরণে অত্যন্ত কাতর ও উত্তেজিত হইয়া মামাকে বলিলেন—"মামা, এতদিন পরে আপনি ঘরে এসেছেন, কোথায় আপনার যত্ন ও সেবা শুশ্রূষা করবো, আপনার কাছে বসে কত নূতন কথা শুনবো, তা হলো না; মামা, মা কি বাবা আপনাকে চিনেও চিন্‌বেন না, দেখ্‌লেন ত! তাঁদের মতলব খারাপ, মামা, এমন জায়গায় আর থেকে কাজ নেই, চলুন, আমি

আপনার সঙ্গেই চলে যাব, এ ভয়ানক সংসারে আর থাকবো না।”

সন্ন্যাসীচরণ পূর্ব্ব হইতেই উঠিবেন উঠিবেন মনে করিতে-ছিলেন, এখন খোকার কথায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ইতিমধ্যে গৃহ হইতে তাঁহার স্ত্রী ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পাদুখানি জড়াইয়া ধরিলেন। এতক্ষণ এত লোক জনের সম্মুখে তিনি লজ্জায় আসিতে পারিতেছিলেন না, কিন্তু তাহার ইহ পরকালের সর্ব্বস্ব, স্বামী, দেবতা এতদিন পরে আসিয়া আবার চলিয়া যান দেখিয়া, লজ্জা সরম ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া স্বামীর পদতলে আসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—“ওঁরা চিনিতে পারিলেন না বলিয়া আমি কি অপরাধ করিলাম, আমায় পায়ে ঠেলিয়া কোথায় যাইবেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যান্. আমি কার কাছে আর থাকবো বলুন ?” তাঁহার নয়ন-অশ্রুতে স্বামীর পাদুখানি ভিজিয়া গেল, হৃদয় ভিজিল কি না তিনিই জানেন।

সন্ন্যাসীচরণ কি ভাবিয়া তাঁহার স্ত্রীর হাত ধরিয়া তুলিলেন, বলিলেন—“না, এ সংসারে তোমাদের আর থাকা উচিত নহে।” মনে মনে বলিলেন—“আমি বিষয়ের প্রত্যাশী নই, জন্মভূমির দর্শনাভিলাষী হইয়াই আসিয়াছিলাম, কিন্তু সংসার এমন নির্ম্মম হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। ঠাকুর, ইহাও তোমার শিক্ষা।” প্রকাশ্যে আবার বলিলেন—“বেশ্ তোমরা চল, তোমাদের কোন আশ্রয় করিয়া দিব। দেখিতেছি, আমার কর্ম্মের এখনও অবসান হয় নাই, কি ভাবিয়া আসিলাম, আর ঘণ্টা কয়েক পরে কি ভাবেই বা যাইতেছি! হা ভগবান্!”

তাঁহারা তিনজনে তখন বাড়ীর বাহির হইলেন। প্রতিবাসী প্রবীণ ব্যক্তিরা তখন সকলেই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন,

হাঁ এ সন্ন্যাসীই বটে, বিষয়ের লোভে মাগী কি না, এমন ভাইকে চিন্‌তেই পারলে না, ছিঃ ছিঃ। এতদিন পরে ভাই এল, তাকে আদর যত্ন করা দূরে থাক, কি না দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। পেটের ছেলে, ছোট ভাজ, তারাও চলে যাচ্চে, তবুও মুখে একটা কথা নেই! কি পাষাণী, কি চণ্ডালী। ছিঃ ছিঃ! "এইরূপে সকলেই ধিক্কার দিতে দিতে বাড়ীর বাহির হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সন্ন্যাসীচরণ তখন গ্রামস্থ ভদ্রলোক-দিগকে বিনয় করিয়া বলিলেন," "আপনারা দুঃখিত হবেন না, আমার দিদির মাথা খারাপ হয়ে গেছে, এরপর তিনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন। আপনারা আর কষ্ট কর্‌বেন না। বেলা অতিরিক্ত হয়ে গেছে, আপনারা সকলে বাড়ী যান্।"

একজন বৃদ্ধ আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন—"তাও কি হয় বাপু, এই ভর্ দুপুরবেলা তোমরা গ্রাম থেকে অভুক্ত অবস্থায় চলে যাবে? আর আমরা ঘরে গিয়ে গিল্‌বো! কেন, একি চণ্ডালের গ্রাম! তোমরা আমার বাড়ীতে এস, না—কিছুতেই তোমরা এখন যেতে পার্‌বে না।" বৃদ্ধের আগ্রহ যত্নে তাঁহারা বাধ্য হইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া তাঁহার বাটীতে যাইলেন। মধ্যাহ্নে তথায় আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলেন। এদিকে সন্ন্যাসীচরণের বাটীতে সে সংবাদ গেল, তাঁহার দিদি ও ভগিনীপতি শুনিয়া বৃদ্ধকে গালি দিতে লাগিলেন। পাড়ার প্রবীণ সকলকেই গালি দিতে দিতে অম্লানবদনে আহারাদি করিলেন। সায়াহ্নে গ্রাম গ্রামান্তর হইতে জনগণ দলে দলে সন্ন্যাসীচরণকে দেখিতে আসিল, কিন্তু তাঁহার দিদি ও ভগিনীপতি আর বাড়ীর বাহির হইলেন না। গ্রামশুদ্ধ লোক একদিকে আর

তাঁহারা একদিকে। উপযুক্ত সন্তানকেও তাঁহারা বিসর্জ্জন দিতে পারিলেন, কিন্তু সামান্য বিষয়ের মমতা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহারা ভুলিতে পারিলেন না। এদিকে সন্ন্যাসীচরণ তাঁহার স্ত্রী ও ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইয়া নৌকায় চড়িলেন। স্ত্রীর আত্মীয় স্বজন আসিয়া তাহাদের ফিরাইবার জন্য কত যত্ন, সাধ্য সাধনা করিলেন, কিন্তু তাহারা কেহই আর ফিবিলেন না। নৌকা ছাড়িয়া দিল, দেখিতে দেখিতে নৌকা সকলের দৃষ্টির বাহির হইয়া গেল। তখন সকলে হায় হায় কবিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পুনর্ম্মিলন।

চিন্তামণি ও কালীচবণ দুজনেই সেদিন গৃহে ছিলেন না, সন্ন্যাসীচরণ আসিয়াই প্রথমে তাঁহাদের সন্ধান লইয়াছিলেন। তাঁহারা গ্রামে প্রবেশ করিবামাত্র সন্ন্যাসীর বিষয় সমস্ত শুনিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ না হওয়ায় তাঁহারা নিতান্ত দুঃখ অনুভব করিলেন। অনন্তর অনুসন্ধানে অবগত হইলেন, তাঁহারা উপস্থিত কালীঘাটের দিকে গিয়াছেন। কালীচরণ আর কালবিলম্ব না করিয়া তখনই চিন্তামণিকে সঙ্গে করিয়া কালীঘাটে যাইলেন এবং ঘাট মন্দির ও যাত্রী-গৃহাদি নানা স্থানে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এদিকে সন্ন্যাসীচরণ স্ত্রী ও ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইয়া যখন কালীঘাটে আসিলেন, তখন দেবীর আরতি হইতেছিল, সুতরাং তাঁহারা প্রথমেই মায়ের আরতি

দর্শন করিলেন, পরে রাত্রিবাসের জন্য একটী গৃহের অনুসন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন। রাত্রি তখন প্রায় দশটা বাজিয়াছে—তাঁহারা গৃহস্থের বহির্বাটীতে একটী ঘর পাইয়া সেই স্থানেই আশ্রয় লইলেন। সঙ্গে এক লোটা ও কম্বল ব্যতীত সন্ন্যাসীচরণের আর কিছুই সম্বল ছিল না, তাঁহার স্ত্রী এবং ভাগিনেয়ও আসিবার সময় প্রায় এক বস্ত্রেই তাঁহার সঙ্গী হইয়াছেন। গৃহস্থ তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া কিছু জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন ও একখানি মাজুরী দিলেন। তাঁহারা সে রাত্রি সেইস্থানেই কোনরূপে রাত্রিযাপন করিলেন। কাজেই কালীচরণ ও চিন্তামণি সে রাত্রিতে তাঁহাদের কোন সন্ধান পাইলেন না। তবে মন্দিরের এক ব্রাহ্মণের মুখে শুনিলেন যে, একটী সাধুর সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক ও একটী বালককে তিনি দেখিয়াছেন। এই সংবাদ-মাত্র পাইয়াই তাঁহারা কতকটা আশান্বিত হইয়া কালীঘাটে এক যাত্রীগৃহে অবস্থান করিলেন। মনে করিলেন, পরদিন প্রাতে নিশ্চয়ই তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইবেন। তাঁহারা কোনরূপে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া অতি প্রত্যুষে ঘাটে আসিলেন, শৌচাদি সমাপন করিয়া স্নান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, দূরে সন্ন্যাসীও স্নানে আসিতেছেন, পশ্চাতে তাঁহার স্ত্রী ও ভাগিনেয় রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র তাঁহারা উভয়েই আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন, কালীচরণ সন্ন্যাসীকে দুই বাহু দিয়া আলিঙ্গন করিলেন, তাহার পর চিন্তামণিও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সন্ন্যাসী তাঁহা-দিগকে মধুর বচনে পরিতুষ্ট করিলেন, তাঁহার মুখে ঠাকুরদাসের সংবাদ পাইয়া তাঁহারা আনন্দিত হইলেন। তাহার পর সকলে

স্নানাদি সমাপন করিয়া একটী যাত্রীগৃহে অবস্থান করিলেন। কালীচরণ বাজার করিয়া আনিলে, সন্ন্যাসীর স্ত্রী পাকশাক করিয়া সকলকে পরিতোষভাবে আহার করাইলেন। আহারান্তে সকলে বিশ্রাম করিবার সময় আবার সন্ন্যাসীচরণকে তাঁহারা কত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীকে গৃহস্থ হইবার জন্য তাঁহারা খুবই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী তাহাতে হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"আমি ত নামেই সন্ন্যাসী ভাই, গৃহস্থ গন্ধ কি আমার গাত্র হইতে মুছিয়া গিয়াছে? আমার কর্ম্মভোগ এখনও ত পূর্ণ হয় নাই, দেখিতেছ না! নহিলে কোথায় জন্মভূমি দর্শন করিয়া চুপি চুপি চলিয়া যাইব, না এ কি ঝন্‌ঝাট্ ঘাড়ের উপর চাপিয়া বসিল। মহামায়ার একি ভীষণ মায়াজাল! দেখি, জগদম্বার মনে আরও কি আছে!"

চিন্তামণি বলিলেন—"তবে চল দেশে ফিরিয়া যাই।"

সন্ন্যাসী—"না আর ও দেশে ফিরিব না, যখন ভেলা ভাসাইয়াছি, দেখি কোথায় গিয়া ঠেকে। তোমরা বাল্যবন্ধু, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও, তোমরা মনের সুখে সংসারে আনন্দানুভব কর, আমার বিষয় ভাবিও না, আমি ইহাদের কোন স্থানে স্থির করিয়া দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইব।"

কালীচরণ অনেক অনুরোধ করিলেন, চিন্তামণি অনেক বুঝাইলেন, কিছুতেই তিনি ভিন্নমত করিলেন না। ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল, সন্ন্যাসী তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যাইবার সময় অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া খোকার হস্তে কিছু টাকা দিয়া যাইলেন। আর খোকাকে বলিলেন—"বাবা কি বলিব

তোমরা আর ঘরে ফিরিবে না! তবে আমাদের এই অনুরোধ রেখো। যদি কোথাও কোনরূপে তোমরা কষ্ট পাও, তখনই পত্র লিখিও তাহাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না! মাঝে মাঝে তোমাদের কুশল সংবাদ দিবে, আর যেখানেই থাক খুব সাবধানে থাকিবে।"

সন্ন্যাসীচরণ বন্ধুদ্বয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কাশীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নানা দেশ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাঁহারা কাশী চতুঃষষ্টি যোগিনীর ঘাটের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেইস্থানেই এক পরিচিতের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার স্ত্রী ও ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইয়া মুনিঋষির মত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে নানা শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রায় দুইবৎসরকাল এইভাবে বাস করিবার পর এক দিবস সন্ন্যাসীচরণ বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে দিব্যকান্তি, অপূর্ব্ব জ্যোতিঃপূর্ণচক্ষুবিশিষ্ট কমণ্ডলুধারী এক সাধুপুরুষ পশ্চাৎ হইতে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। তিনি ফিরিয়া দেখেন, তাঁহার সেই বড় আকাঙ্ক্ষার ধন চির-আনন্দপ্রদ অভিন্নহৃদয় বন্ধু ঠাকুরদাস; কিন্তু আজ তাহাকে এতদিন পরে সহসা এমন অবস্থায় দেখিয়াও পূর্ব্বের মত সরলভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না, তৎপরিবর্ত্তে কি যেন কি মন্ত্রবলে তাঁহার চরণ-প্রান্তে মস্তক স্পর্শ করাইয়া অতি ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরদাসও অনতিবিলম্বে অত্যন্ত স্নেহসহ তাঁহার দুইটী বাহু ধরিয়া তাঁহাকে বক্ষে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। ঠাকুরদাস এখন আর পূর্ব্বের সেই ঠাকুরদাস নাই, তাঁহার অনেক

পরিবর্ত্তন হইয়াছে ; তাঁহার দেহ-কান্তি যেমন লাবণ্যময় তেমনই ধীর শান্ত ও গম্ভীর হইয়াছে, তাঁহার দৃষ্টি স্থির, উজ্জ্বল ও সর্ব্বশরীর হইতে তাঁহার কি এক অপূর্ব্ব তেজ সর্ব্বদা বাহির হইতেছে। কত সাধু সন্ন্যাসী শিক্ষা দীক্ষা লাভের আশায় সতত তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। তিনি এখন তাঁহার সেই পূজ্যপাদ ঠাকুরের প্রদত্ত "ঠাকুর সদানন্দ" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছেন।

সন্ন্যাসীচরণের এরূপ কুণ্ঠিত আচরণ দেখিয়া তিনি পূর্ব্বের ন্যায় প্রীতিপূর্ণ ভাবে বলিলেন—"ভাই, বেশ ভাল আছ ত? চল, তোমার বাসায় যাই।" অনুচর সাধুদিগকে বলিলেন, "তোমরা মঠে যাও, আমি একটু পরে যাইতেছি।" তাঁহারা সকলে তাঁহার আদেশমাত্র মঠে চলিয়া যাইলেন। তিনি সন্ন্যাসী-চরণের সহিত নানা কথায় বার্ত্তায় তাঁহার বাসায় যাইলেন। তথায় সন্ন্যাসীর স্ত্রী ও ভাগিনেয় আসিয়া তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার পদধুলি গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া সন্ন্যাসীচরণকে বলিলেন—"আমি ঠাকুরের নিকট তোমাদের সকল সংবাদ শুনিয়াছি। বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে ঠাকুর অঘোরানন্দ দাদামহাশয়ের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হয়, সে সময় আমি অমরকণ্টকে ছিলাম। দুই বৎসর পরে আমার সহিত তোমার এই কাশীতেই যে, সাক্ষাৎ হইবে, সে কথাও তিনি তখন তোমায় জানাইয়াছিলেন। তাহার পর তোমার বাটী-গমন, তোমার দিদির অসদ্ব্যবহার, ইহাদের সঙ্গে করিয়া আনয়ন, সমস্ত কথাই আমি শুনিয়া ছিলাম। [illegible] ঠাকুরের আদেশে

আমি তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। তোমার বংশ রক্ষা হইবে, তোমার স্ত্রীও গর্ভবতী, আর সাত মাস পরে তোমার একটী পুত্র সন্তান হইবে। তুমি তাহার শাস্ত্রীয় সংস্কারগুলি সম্পন্ন কর। ইতিমধ্যে তোমার ভাগিনেয়ের বিবাহ দিয়া দাও। আমি এখানে আরও দুই চারি দিন আছি; ঠাকুরের আদেশবাণী ও আরও অনেক কথা আছে, তাহা তোমায় নির্জ্জনে বলিব। আজ সন্ধ্যার সময় তুমি কামাক্ষ্যামন্দিরে যাইও। আমি তথায় তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। এখন আমি আসি, তোমার বাসা দেখিয়া যাইলাম, প্রয়োজন হইলে পুনরায় আসিতে পারিব। মঠে আমার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করিতেছে।” সন্ন্যাসীচরণ আর কোন কথা না বলিয়া পুনরায় প্রণাম করিলেন, তাঁহার স্ত্রী ও ভাগিনেয়ও প্রণাম করিলেন। তিনি মঠে চলিয়া যাইলেন।

সন্ধ্যার পর কামাক্ষ্যামন্দিরে আরতি হইতেছে, জন কয়েক ভক্তিবান দর্শক হাত যোড় করিয়া তাহাই দেখিতেছেন, ঠাকুর সদানন্দ সেই সময় তথায় উপস্থিত হইলেন; তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার সম্মুখ ছাড়িয়া দিলেন। তিনি ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে একটী মনোরম স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। দর্শকবৃন্দ দেব-দর্শন ভুলিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহাকেই ভক্তি-ভাবে দেখিতে লাগিলেন। আরতি হইয়া গেল, তিনিও স্তব সমাপ্ত করিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন, তাঁহার দেখা দেখি সকলেই সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলেন ও অতি কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাসীচরণ পশ্চাতে ছিলেন, তিনিও তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তাঁহার সঙ্গে অদূরে একটী নির্জ্জন বৃক্ষমূলে আসিয়া উভয়ে উপবেশন করিলেন।

বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাদের কত কি কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। অবশেষে সদানন্দজী বলিলেন—“ঠাকুর যে সমস্ত কথা বলিতে বলিয়াছিলেন, তাহা ত সবই বলিলাম, এখন তুমি সেই মতই সমস্ত কার্য্য করিবে। অঘোরানন্দ দাদাকে দেখিলেই বোধ হয় তুমি চিনিতে পারিবে,—সেই গঙ্গাসাগরে যাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তোমাকে দেখিয়াই যিনি আমার বিষয় সমস্ত বলিয়াছিলেন। তুমি তাঁহাকে চিনিতে না পারিলেও তিনি তোমায় নিশ্চয় চিনিতে পারিবেন। তোমাকে তিনি পূর্ব্বে আরও কয়েকবার দেখিয়াছিলেন, তাহা তুমি জানিতে পার নাই উত্তরাখণ্ডে সেই পাহাড়ের ধারে তিনিই আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিলেন, তোমরা তখন লক্ষ্য কর নাই। আবার রাত্রি-কালে যখন তোমরা ধুনি জ্বালিয়া বসিয়াছিলে, তখনও তিনি তোমাদের কয়েক বার দেখিয়াছিলেন, এবং তাহার পরদিন তিনিই অন্যান্য যাত্রী সাধুদিগকে সঙ্গে করিয়া তোমাদিগকে কমণ্ডলু হইতে জল ও গুড় দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে তাঁহার জন্ম না হইলেও তিনি প্রয়োজন হইলে বেশ বাঙ্গালা বলিতে পারেন। তিনি যেমন পণ্ডিত তেমনই উচ্চ অঙ্গের সাধক ঠাকুর অনেক সময় তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন সেই মন্দিরের মধ্যে যে সকল গুপ্ত সাধন-শাস্ত্র দেখিয়াছিলে, সে সমস্তই তিনি ঠাকুরের আদেশে তথায় সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন তিনি এখনও নানাদেশে পরিভ্রমণ করিতেছেন, শীঘ্রই কাশীতে আসিয়া বসিবেন, তাহার পর তিনি আর কোথাও যাইবেন না। ঠাকুর তাঁহার প্রতিই তোমাদের শেষ উপদেশের ভার দিয়াছেন তুমি সময় মত সকলকে এ সংবাদ দিও। আজ অনেক রাত্রি হইয়াছে

চল, তোমায় একটু আগাইয়া দিয়া আসি।" এই বলিয়া উভয়ে বৃক্ষমূল হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

ঠাকুর সদানন্দ সন্ন্যাসীচরণের নিকট বিদায় লইয়া সেই গভীর রাত্রিতেই কোথায় যে চলিয়া যাইলেন, মঠস্থিত তাঁহার সঙ্গী সাধুরাও তাহা তখন জানিতে পারিলেন না। সেই প্রথম তীর্থ-যাত্রার পর দ্বাদশ বৎসর কাল তাঁহার অতীত হইয়া গিয়াছে, তিনি পূজ্যপাদ ঠাকুরের আদেশে কাশীধামে সন্ন্যাসীচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। এক্ষণে সে কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি সেই রাত্রিতেই কলিকাতার অভিমুখে রহনা হইলেন। দ্বাদশ বৎসর অন্তে গোপনে একবার জন্মভূমি দর্শন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সেই কারণ সঙ্গী সাধু শিষ্য-গণকে কোন কথা না বলিয়াই তিনি চলিয়া যাইলেন। কিছুদিন পরে যথাসময়ে তিনি নিজ জন্ম স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ বা পরিচয় না করিয়া সিধা আপনার বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মধ্যম সহোদর শিরোমণি দাদা একাই চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। তিনি বীরাচারী তান্ত্রিক সাধক, পূজার সময় কারণ ব্যবহার করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। এই মাত্র পূজা সমাপন করিয়া তিনি বাহিরে আসিয়াছেন, সুতরাং কারণের প্রভাব তখনও কিঞ্চিৎ বিদ্যমান ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি চিনিতে না পারিলেও, সাধু ও অতিথি বলিয়া তাঁহাকে আসনে বসিতে বলিলেন, এবং পুনরায় তামাক সাজিতে আরম্ভ করিলেন। স্বামী সদানন্দ একাধিক্রমে এই বার বৎসর পশ্চিমা সাধুদিগের সহিত বাস করিয়া ও সর্ব্বদা হিন্দি ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া হিন্দিতে এতই অভ্যস্থ

হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিলে কেহই সহসা তাঁহাকে বাঙ্গালী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। তিনি প্রথম হইতেই তাঁহার দাদার সহিত হিন্দিতে কথা কহাতে, দাদা তাঁহার কণ্ঠস্বর ও আকার প্রকার দেখিয়া সম্পূর্ণ সন্দেহ সত্ত্বেও হঠাৎ কিছু বলিতে পারিলেন না; তবে তামাক সাজিতে সাজিতে তাঁহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ও তাঁহার সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতেছিলেন। বাটীর পুরাতন গৃহের সংস্কার, কন্যা ও আত্মীয় সকলের বিষয় যখন প্রশ্ন করিলেন, তখন তাঁহার সন্দেহ ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। তিনি নিজে তামাক খাইয়া হুঁকার মুখ হইতে কলিকাটী খুলিয়া তাঁহার হাতে দিলেন, সদানন্দজী কলিকাটী হাতে লইয়া চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নামিয়া একটু অন্তরালে যাইলেন। কারণ, তিনি কখনই দাদার সম্মুখে তামাক খান নাই, আজ সাধু হইয়াও সে পূর্ব্ব সংস্কার তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সংস্কার এমনই অপরাজেয় বস্তু! তাই আর্য্যশাস্ত্র সুসংস্কারের এত পক্ষপাতী। যাহাহউক ইহাতে শিরোমনি মহাশয়ের আর কোন সন্দেহ না থাকিলেও, কারণ-গ্রহণ-জনিত নিজ মস্তিষ্কের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ প্রত্যয় না করিয়া, তাঁহার অনুমান যে মিথ্যা নহে, তাহাই স্থির করিবার অভিলাষে তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া তাড়াতাড়ি পার্শ্ববর্ত্তী বাটীতে তাঁহার এক আত্মীয়কে ডাকিতে যাইলেন। তাঁহারাও শুনিবামাত্র তখনই সদলে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলেন, চণ্ডীমণ্ডপে বা নিকটে কেহই নাই, তবে সেই কলিকাটী সম্মুখেই বসান রহিয়াছে। এদিক ওদিক করিয়া চারিদিকে সকলে তন্ন তন্ন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার দেখা পাওয়া গেল না। যেন দ্রুতগামী পক্ষীর মত

তিনি কোথাও উড়িয়া যাইলেন। শিরোমণি মহাশয় হায় হায় করিয়া বালকের ন্যায় চিৎকার করিতে লাগিলেন, আর দুই হাত দিয়া কপাল চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিতে লাগিলেন—"এতদিন পরে আমার ঠাকুরদাসকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দিলাম।" সকলে বলিতে লাগিলেন—"সিদ্ধ সাধুরা আত্ম গোপন করিতে পারেন, ঠাকুরদাসও নিশ্চয় সিদ্ধ হইয়াছেন, নতুবা সাধারণ মানুষ কি চখের সামনে দিয়া এমন করিয়া পালাইতে পারে? যেরূপ ভাবে খোঁজা হইল, তাহাতে ত কোথা দিয়াও লুকাইয়া গাম হইতে পালাইবার উপায় নাই। হায় হায়! আমাদেরও দুর্ভাগ্য এমন সাধু মহাত্মার দর্শন পাইলাম না!" বাস্তবিক তিনি যেন কোন্ দৈববলে উধাও হইয়া যাইলেন। ইহা যে তাঁহার যোগ-বিভূতি সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। সেইদিনই কালীঘাটে তাঁহার এক আত্মীয়া মাথায় কাপড় না দিয়া কালীদর্শন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহাকে স্নেহ-তিরস্কার স্বরে বলিলেন— "এরে বেটী, এমন করিয়া কি ঠাকুর দর্শন করিতে হয়? মাথায় কাপড় দে, গলায় আঁচল দিয়া হাতযোড় করিয়া দর্শন কর্।" তিনি দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সদানন্দ প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক তাহার হাতে কয়েকটী জিনিস দিয়া বলিলেন— "এটি তুই নিস্, আর এই কয়টী আমার মেয়েদের দিস্।" আত্মীয়া যত্ন করিয়া তাহা কাপড়ে বাঁধিতেছেন, ইতিমধ্যে তিনি অলক্ষ্যে—কোথায় যে সরিয়া পড়িলেন, আর দেখা গেল না। মাঝে মাঝে তিনি এমনই করিয়া তাঁহার জন্মভূমি দর্শন করিবার সময় কোন কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা করিয়া

যাইতেন। তবে কখনও তাঁহার স্ত্রী বা কন্যাদিগের সহিত দেখা করেন নাই, অথবা তিনি হয় ত তাঁহাদের দেখিয়া থাকিবেন, তাঁহারা চিনিতে পারেন নাই। কালীচরণ ও চিন্তামণির সহিতও তাঁহার আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হরিচরণ।

ঠাকুর সদানন্দ এখন তাঁহার পূজ্যপাদ ঠাকুরের আদেশে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সাধু সন্ন্যাসী দিগকে উপদেশ দিয়া বেড়াইতেছেন। কোন এক দুর্গম তীর্থে একজন বাঙ্গালী তীর্থযাত্রী একা পীড়িত অবস্থায় পড়িয়া আছে, নিকটে কেহ নাই, সঙ্গীযাত্রীরা তাহার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ফেলিয়া পলাইয়াছে। নির্ব্বোধ স্বার্থপর তীর্থযাত্রীদের মধ্যে এরূপ ঘটনা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। ঘটনাচক্রে সদানন্দজী সে সময় তথায় উপস্থিত হইয়া লোকটীকে অতি বিপন্ন অবস্থায় পতিত দেখিয়া, তাহাকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটী একে রোগ-যন্ত্রণায় কাতর, তাহার উপর নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় অবস্থায় অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছে; তাঁহাকে দেখিয়া সে ব্যক্তি 'হাউ' 'হাউ' করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন, স্নেহভরে তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কত আশ্বাস বাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিলেন, পিপাসায় অত্যন্ত কাতর দেখিয়া নিজ কমণ্ডলু হইতে তাহার মুখে

জল দিলেন। প্রভুর পবিত্র কর-স্পর্শে সে যেন ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিল, তাহার নিদ্রা আসিল। তখন তিনি স্নানাদি নিত্য কর্ম্ম সমাপনের জন্য অন্তত্র চলিয়া যাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তখনও সে নিদ্রা যাইতেছে। তিনি আহারাদি সমাপন করিয়া তাহার জন্য কিঞ্চিৎ প্রসাদ রাখিলেন। পরে তাহাকে ডাকিয়া তাহা খাইতে বলিলেন। সে তাঁহার আদেশ প্রাপ্তিমাত্র উঠিয়া সেই প্রসাদ ভক্ষণ করিল। তাহার পর সে যেন নিজেকে অনেকটা সুস্থ মনে করিতে লাগিল। ক্রমে শরীরেও যেন বেশ বল অনুভব করিতে লাগিল। তাহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আর তোমার কোন অসুখ হইবে না, এখন তুমি ধীরে ধীরে চলিয়া যাও, তোমার সঙ্গীরা এই পথে গিয়াছে।"

সে কাঁদিয়া তাঁহার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিল, বলিল— "প্রভু যখন দয়া করিয়াছেন, জীবন দিয়াছেন, তখন আর আমায় পায়ে ঠেলিবেন না, একটু স্থান দিন, আমি আর কোনও সঙ্গী চাই না, আমি আপনার সেবা করিতে পাইলেই এখন ধন্য হইব।"

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আমার আর কি সেবা করিবে বাবা? তুমি তোমার নিজের সেবা করিতে পারিলেই হইল, আমার সেবার কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যাও। সে তাঁহার সে কথায় কান না দিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিল, কিছুতেই ছাড়িল না। তাহার একান্ত অধীরতা দর্শনে তিনি কৃপা করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা কিছুদিন আমার সঙ্গেই থাক, কিন্তু বেশী দিন ত থাকিতে পারিবে না বাবা, তোমার

গৃহস্থসম্পর্ক ত এখনও শেষ হয় নাই।” সে ভক্তিভরে পুনবায় প্রণাম করিয়া বলিল “প্রভু আপনার কৃপা হইলে নিশ্চয় আমি শান্তি লাভ করিব।”

লোকটীর বাড়ী কালীঘাটে, নাম—হরিচরণ, কালীঘাটে তাহার ডালার দোকান আছে, সামান্য লেখাপড়াও জানে, কিন্তু তাহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল। তা' না হইলে এ অবস্থায় এমন সঙ্গই বা পাইবে কেন? কালীঘাটেও সে সর্ব্বদা বহু সাধুসন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিত ও বিবিধ প্রকারে তাঁহাদের সেবা করিত। সামান্য ডালাওয়ালা হইলেও তাহার এরূপ ধর্ম্মবুদ্ধি ও সাধুসঙ্গের ইচ্ছা, নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের ঐকান্তিক সাধনার ফল বলিতে হইবে। সাধু সদানন্দ তাহার ভবিষ্যৎ অবস্থা বুঝিতে পারিলেও, যতদিন তাহার এরূপ সাধুসঙ্গ ও তীর্থ ভ্রমণের যোগ আছে, ততদিন তাহাকে নিজের সঙ্গেই রাখিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সদানন্দজী সে সময় পুনবায় তীর্থ ভ্রমণেই বাহির হইয়াছেন, কিছুদিন একাকীই সচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইবেন, এমনই তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দৈবযোগে হরিচরণ সঙ্গী হওয়ায় তাহা ঠিক হইল না, তবে তাঁহার বিশেষ অসুবিধাও হয় নাই। তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া নানা তীর্থ পর্য্যটনের পর কাঙ্গড়া উপত্যকা-স্থিত জলন্ধর খণ্ডে জ্বালামুখী দেবী দর্শনান্তর রোয়ালসর বা রোয়ালসরোবর নামক তীর্থে যাইলেন, স্থানটী প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা-নিকেতন। এখানে ভাসমান পর্ব্বতের উপর শিবমন্দির আছে। হরিচরণ ঠাকুর সদানন্দের সঙ্গে এইরূপ কত দুর্গম ও অদ্ভুত তীর্থ দেখিতে দেখিতে পরম আনন্দে চলিয়াছে। কিছুদিন পরে স্বামীজী এক অতি নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ

করিলেন। না আছে তথায় মানবের সমাগম, না আছে কোন আশ্রয়গৃহ, বন্য ফল মূল ব্যতীত কোন অভিলাষিত আহার্য্য প্রাপ্তির কিছুমাত্র আশা নাই। চারিদিকে বনচারী জীব জন্তুরাই সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে, তাহারাই যেন এখন সঙ্গের সাথী, বৃক্ষমূলই তাঁহাদের পরম শান্তিপূর্ণ আশ্রম-ভূমি হইয়া পড়িয়াছে। হরিচরণ এখন সদানন্দজীর প্রকৃতই সেবক হইয়াছে; যতই দুর্গম বা যেমনই ভীতিপ্রদ স্থান হউক না, সে তাঁহার সহিত এখন নির্ভয়ে ভ্রমণ করে, প্রসাদ রূপে যখন যাহা পায়, তাহাই খাইয়া পরম তৃপ্তিবোধ করে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস প্রভুর সঙ্গে থাকিলে আর ভাবনা কি? যাহাহউক প্রায় সপ্তাহকাল বনে বনেই কাটীয়া গেল। শেষ দিবস ঘটনাচক্রে কোন আহার্য্যই জুটিল না, সুতরাং সেদিন সম্পূর্ণ অনাহারেই কাটাইতে হইল। ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসেও যে উদরপূর্ণ আহার্য্য জুটিয়াছিল তাহাও নহে! কাজেই পরদিন হরিচরণ ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না; কারণ তাহার প্রভুও যে অভুক্ত অবস্থায় রহিয়াছেন। চলিতে চলিতে ক্রমে দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইল, হরি একবার চলে একবার বসে, সদানন্দপ্রভু তাহার নিতান্ত কষ্ট দেখিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তাহাকে বলিলেন—"আজ তোমার ভারি কষ্ট হইতেছে নয়? অনেকটা বেলাও হইয়াছে, দেখদেখি এই বাঁ দিকে জল আছে কিনা?"

হরিচরণ একটু বিশ্রাম করিয়া জলের অনুসন্ধানে চলিল। কিয়ৎ পরে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অন্যদিক হইতে ছুটীয়া আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল, মুখে তাহার

কথা ফুটে না, গায়ে গল্ গল্ করিয়া ঘাম হইতেছে। ঠাকুর সকল ঘটনা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—"ভয় কি, স্থির হও, তোমায় এদিকে যাইতে বলিয়াছিলাম, তুমি ওদিকে গেলে কেন?" বলিতে বলিতে কয়েকটা বড় বড় হনুমান আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিচরণ ভয়ে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ঐ ঐ"। তিনি বলিলেন—"ভয় নেই, স্থির হও"। এইবার তাহাদের নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ছেলেটা ভুল করে ওদিকে গিয়েছিল, বুঝতে পারেনি, আমিই ওকে এইদিকে জল আন্‌তে পাঠিয়েছিলাম।" হরিচরণকে বলিলেন—"এদেব দেখেই ভয় পেয়েছ? এরা তোমায় কিছু বল্‌বে না, এরা শ্রীরঘুনাথজীর পরম ভক্ত, বড়ই ভাল, তুমি ভুল রাস্তায় গিয়েছিলে বলে তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। যাও, ঐদিকে যাও দেখি, জল পাবে।" হরিচরণের আর উঠিবার ভরসা হইতেছে না। তিনি তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আবার বলিলেন,—"কোনও ভয় নেই, তুমি নির্ভয়ে যাও।" হরিচরণ কি করে, পুনঃ পুনঃ প্রভুর আজ্ঞা; অগত্যা অতি ভয়ে ভয়ে জল আনিতে গেল। তাহার ভয়, পাছে সেই হনুমানের দল আবার তাহাকে আক্রমণ করে। সে খানিক দূর যায়, আবার পিছনে ফিরিয়া চায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হনুমানগুলা তাহার দিকে আর লক্ষ্যও করিল না। কিয়ৎ পরে সে নির্ব্বিঘ্নে জল লইয়া ফিরিয়া আসিল। স্বামীজী তখন হনুমানদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বাবা, ছেলেটার দুদিন খাওয়া হয়নি, কিছু ফল টল খাওয়াও।" এই কথা শুনিয়াই একটা হনুমান তিন লাফে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার পর একটী দেশী কুমড়ার মত কি ফল এক হাতে দিয়া বুকে জাপটাইয়া

ধরিয়া লইয়া আসিল ও স্বামীজীর সম্মুখে রাখিয়া দূরে যাইয়া বসিল। তিনি অনতিবিলম্বে নিকটস্থ কতকগুলি কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলেন ও হাতে করিয়াই ফলটী শেঁকিতে লাগিলেন, পরে আগুনের পার্শ্বে তাঁহার পায়ের উপর ফলটীর একদিক রাখিযা প্রয়োজন মত দুইহাত দিয়া তাহা ঘুবাইতে ঘুবাইতে বেশ করিয়া শেঁকিতে লাগিলেন। জ্বলন্ত আগুনের আঁচে তাঁহার হাত একটুও পুড়িল না বা তাহাতে একটু ফোস্কাও উঠিল না। হরিচরণ ত তাঁহার এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক! কারণ সে এতদিন তাঁহার সঙ্গে আছে, এরূপ অদ্ভুত কার্য্য কখনই দেখে নাই। বাস্তবিক সদানন্দপ্রভু কোনও লোকের কাছে তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তি দেখাইতেন না। তিনি সর্ব্বদা শান্তশিষ্ট সাধারণ লোকের মতই থাকিতেন। এখানে ফলটী শেঁকিবার জন্য নিকটে ইষ্টকাদি কিছু না পাইয়া বাধ্য হইয়াই এরূপ করিয়াছিলেন। বিশেষ এস্থলে অন্য কোন লোকজনেরও আগমনের কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না। তিনি সিদ্ধ মহাপুরুষ, তাঁহার পক্ষে এরূপ ঘটনা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; তবে নির্ব্বোধ হরিচরণের পক্ষে একটু অদ্ভুত বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। যাহাহউক ফলটী বেশ সুসিদ্ধ হইলে, তিনি নামাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া সমাগত প্রায় ত্রিশ পঁইত্রিশটী হনুমানের হাতে একটু একটু করিয়া দিলেন। প্রত্যেকে আসিয়া ধীরে ধীরে তাহা লইয়া গেল। কোন গোল নাই, যেন সব অতি সুবোধ বালকের মত শ্রেণীবদ্ধভাবে বসিয়া তাহা খাইতে লাগিল। হরিচরণ এই ব্যাপার দেখিয়া আরও বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু ক্ষুধায় সে অত্যধিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত সেই ফলটীর প্রায়

সমস্তই হনুমানদেব হাতে দেওয়াতে, মনে মনে স্বামীজীর উপর সে যেন বিরক্ত হইতেছিল। সে ভাবিতেছিল—"কয়দিবস প্রায়ই ত অনাহারে গিয়াছে, ঐ একটী মাত্র ফল নিজে খাইতে পাইলেই বোধ হয় কতকটা ক্ষুধার শান্তি হইত, তা প্রভু একবারও ভাবিলেন না, সবই ওদের ধরে দিলেন, এখন প্রভুই বা কি খাবেন, আর আমিই বা কি খাব!"

সদানন্দদেব সেই ফলের যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার বেশী ভাগ নিজের মুখে দিলেন, আর বাকিটুকু খুব বেশী ওজনে আধ ছটাক আন্দাজ হইবে, তাহাই হরিচরণকে দিলেন। প্রভুদত্ত সেই অতি সামান্য খাদ্য হরিচরণ অগত্যা মুখে দিল। তাহার পর সে একেবারে অবাক্! সে যে কি মধুর, তাহার যে কি অপূর্ব্ব আস্বাদ, তাহা আর কথায় প্রকাশ করিতে পারে না, বিশেষ সেইটুকু খাইয়াই তাহার উদর যেন পূর্ণ হইয়া গেল; অত ক্ষুধার জ্বালা একেবারে নিবৃত্তি হইল, জ্বলন্ত আগুণে যেন শীতল জলস্রোত বহিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন সে আজ কত কি উপাদেয় খাদ্য পরিতোষভাবে আহার করিয়াছে। তখন সে মনে মনে আপনাকে কতই যে ধিৎকার দিতে লাগিল, তাহার আর সংখ্যা নাই। অনন্তর প্রভুর চরণে পতিত হইয়া আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাঁহার প্রতি যে মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিল, তাহা সরল ভাবে প্রকাশ করিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। প্রভু বলিলেন—"তাহাতে আর হইয়াছে কি? তুমি বুঝ্‌তে পার নাই, তাই অমন ভেবেছিলে! এমন জিনিষ তুমি কখনও খাও নাই, এ বড়ই উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য, এখন

দুদিন আর তোমার ক্ষুধার উদ্রেক হ'বে না। এ ফল কেবল এই বনেই জন্মায়। ভগবানের কি অনন্ত করুণা, আর তাঁর কেমন বিচিত্র লীলা, এমন ভীষণ অরণ্যের মধ্যেও দেখ কি চমৎকার ফল ফলিয়ে রেখেছেন! এ ফল কাঁচা খেলে একটু কষা লাগে, আর তাতে সামান্য নেশাও হয়, কিন্তু একটু সেঁকিয়া লইলে বড়ই উপাদেয় ও মোলায়েম হয়। এ ফল কোথায় হয়, হনুমানেরা তাহার সব সন্ধান রাখে। ওরা অবশ্য কাঁচাই খায়, ওদেব ইহাই প্রধান আহার্য্য। অভিজ্ঞ সাধুগণ এ পথে এলে ওরাই তাঁদের এইভাবে ফল দিয়ে সাহায্য করে। ওরা বন্য জীব হলেও দেখ দেখি ভগবানের কত করুণা, তিনি ওদের কেমন বুদ্ধি দিয়েছেন, ওরা ঠিক যেন বুদ্ধিমান মানুষের মত কেমন অতিথি সৎকার করে! "যা হোক এখন এইখানেই একটু বিশ্রাম কর, বেলা পড়লে আবার যাওয়া যাবে।"

তাঁহারা বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, হনুমানগুলির মধ্যে অধিকাংশই এদিক ওদিক চলিয়া গেল, কেবল দুই চারিটা সেই স্থানেই বসিয়া রহিল। বেলা প্রায় চারিটার সময় তাঁহারা বিশ্রাম করিয়া উঠিলেন। তখন হনুমানেরা আবার সব আসিয়া জুটিতে লাগিল। সদানন্দজী তাহাদের বলিলেন—"আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চল।" তাহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল সামনে সামনে চলিল, আর একদল পিছনে আসিতে লাগিল। স্বামীজী হরিচরণকে বলিতে লাগিলেন,—আমরা এখন যে স্থানে যাইব, তাহার আর ভিন্ন পথ নাই, এই নিবিড় বনের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে, কিন্তু সম্মুখের প্রায় এক ক্রোশ পথ অত্যন্তই দুর্গম; যেমন দুর্ভেদ্য জঙ্গল, তেমনি ভীষণ সর্পের

ভয়। এ পথে ইহাদের সাহায্য ব্যতীত একটী পাও আগাইবার উপায় নাই। ঠাকুরের যে কি অদ্ভুত লীলা তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন! এই বন্য জীব, কখন লোকালয় দেখে নাই, কাহারও নিকট কোনরূপ শিক্ষাও পায় নাই, অথচ কেমন স্বাভাবিক বুদ্ধি দেখ দেখি? ইহাদের আচরণ দেখিলে কে না বিস্মিত হইবে! এই দেখ বনের এদিক ওদিক দিয়া কেমন পরিষ্কার পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ যে সামনের হনুমানগুলি দেখিতেছ, উহারা কি করিতেছে জান? সম্মুখে আশঙ্কাপ্রদ কোন কিছু আছে কি না তাহাই দেখিয়া যাইতেছে, অধিক আশঙ্কাপ্রদ কোন কিছু দেখিলে তখনই সে পথ ছাড়িয়া বাঁকিয়া ভিন্ন পথ ধরিতেছে, আর সামান্য কিছু দেখিলে তাহা নিজেরাই পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। অর্থাৎ ছোট খাঁট সাপ বা অন্য কোন হিংস্র জন্তুদিগকে তাহারা তাড়াইয়া যাইতেছে, আর ঐ পিছনের গুলি যাহাতে আবার কোন বিষধর ফিরিয়া আসিয়া আক্রমণ করিতে না পারে, তাহাই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে।" হরিচরণ প্রভুর সহিত অবিরত প্রায় দুই বৎসর যাবৎ ভারতের কত স্থানই পরিভ্রমণ করিয়াছে, কিন্তু এমন স্থান কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। সে তাহাদের বুদ্ধি ও সাধুসেবা দেখিয়া যারপর নাই চমৎকৃত হইতে লাগিল। সেই বনপথ অতিক্রম করিয়া যথাসময়ে নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলে হনুমানগুলা তাঁহাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় স্বামীজী তাহাদের বলিয়া দিলেন, "চারদিন পরে আমরা ফিরিয়া আসিব, তোমরা এখন যাও।" স্বামীজী সর্ব্বদা হিন্দি ভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিতেন, তাঁহার কথা শুনিয়া সহসা বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিতে পারা যাইত না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হিন্দি ভাষা হইলেও হনুমানেরা তাহা কেমন করিয়া বুঝিতে পারিল? তাহারা ত মানুষের কোন ভাষাই জানে না! হয় ত বা প্রভুর আকার ইঙ্গিতেই তাহারা তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া লইয়া থাকিবে। তাহারা ভাষাই বুঝুক, অথবা ইঙ্গিতেই বুঝুক মোটের উপর তাহারা তাঁহার মনোভাব যে বেশ বুঝিয়াছিল, তাহা তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য কলাপ দেখিয়া সহজেই বুঝা যায়। হরিচরণ প্রভুর সহিত সেই দুরাধিগম্য স্থান সকল পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীরঘুনাথজীর দর্শনান্তর চার দিবস পরে সেই হনুমানদের সাহায্যেই পুনর্বার পূর্ব্বস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদেরই প্রদত্ত পুনরায় সেই ফলের একটুমাত্র খাইয়া এক বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিল। অনন্তর প্রভু সদানন্দজী তাহাকে বলিলেন—"এইবার চল, তোমায় আর একটী অদ্ভুত স্থান দেখাইব। কিন্তু সে এখান হইতে অনেক দূর।" হরিচরণ করযোড়ে কহিল—"প্রভু, যতদূরই হউক, আর যত দিনই লাগুক, তাহাতে আমার আসে যায় কি? আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আমি অনায়াসেই যাইতে পারিব"। বিশ্রামান্তে স্বামীজী তাহাকে লইয়া ভিন্ন পথে অগ্রসর হইলেন।

তাহার পর কতদেশ, কত নদী, কত পাহাড় অতিক্রম করিয়া সদানন্দজী হরিচরণকে সঙ্গে লইয়া গিরণার পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, তখনও তাঁহারা পাহাড়ে উঠিতেছেন, অনতিদূরে একটী গহ্বরের পার্শ্বে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শুইয়া রহিয়াছে দেখিয়া হরিচরণ ভয়ে জড় সড় হইয়া স্বামীজীর আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইল। স্বামীজী তাহাকে

শঙ্কিত দেখিয়া, তাহার পিঠে হাত দিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "ভয় কি?" তাহার পর একটু চীৎকার করিয়া বলিলেন—"সচ্চিদানন্দ আছ?" এই শব্দে ব্যাঘ্রটী গা ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়া লেজ নাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে একটী সুন্দর ও অতি কোমল কান্তি বিশিষ্ট যুবা সাধু সেই গহ্বর হইতে বাহিরে আসিয়া ঠাকুর সদানন্দের চরণে অভিবাদন করিলেন। তিনি তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সচ্চিদানন্দ যথাযথ উত্তর দিতে দিতে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া সেই গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্যাঘ্রটীর মুখের পাশ দিয়া যাওয়াতে হরিচরণও ভয়ে একেবারে কাঁটা হইয়া গেল। সদানন্দজী বাঘটীর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"বিজয়া, বেশ ভাল আছ?" বাঘটী তাঁহার উত্তরে আনন্দে যেন গদ গদ হইয়া আরও লেজ নাড়িতে লাগিল ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া জিব বাহির করিয়া যেন কত কি বলিতে লাগিল। বাঘটীর নাম বিজয়া। সচ্চিদানন্দের গুরুদেবের এই গুহাদ্বারে সে সর্ব্বদা প্রহরীর মত বসিয়া থাকে। বৃদ্ধ গুরুজী যখন পর্ব্বতে আরোহণ করেন, তখন এই ব্যাঘ্রই তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যায়। বৎসর কয়েক হইল সচ্চিদানন্দ তাঁহার গুরুদেবের এই আশ্রমে আসিয়াছেন। পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে বদরিকাশ্রমের পথে, সেই গুপ্ত গুহা-মন্দিরে যে বালক সন্ন্যাসীচরণকে ঠাকুর-দাসের পত্র আনিয়া দিয়াছিলেন, যিনি সন্ন্যাসীচরণের পর সেই গুহাস্থিত দেবতার পূজা করিতেছিলেন, তিনিই এখন স্বামী সচ্চিদানন্দ নামে এই আশ্রমে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি

তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে এখানে রাখিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। সদানন্দজীকে পাইয়া সচ্চিদানন্দ পরম আনন্দিত হইলেন, নানা প্রকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমবয়সী আরও দুইটী সাধু (তাঁহারই গুরু ভাই) এখানে ছিলেন, তাঁহারাও সদানন্দজীর পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের একান্ত আগ্রহে তিনি কিয়দ্দিবস এখানে থাকিয়া তাঁহাদের সাধন শাস্ত্র সম্বন্ধে গূঢ় উপদেশ দিতে লাগিলেন। হরিচরণ বাধ্য হইয়া এখন এখানেই রহিল ও গিরণারের আশ্রম গুলির নিত্য নব নব অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া বিমোহিত হইতে লাগিল। এখন সে বিজয়াকে আর তত ভয় করে না, সাহস করিয়া নিকটে যায়, কখন কখন প্রভু নিকটে থাকিলে তাহার গায়ে হাত দেয়, বিজয়াও তাহার সুদীর্ঘ পুচ্ছ নাড়িয়া আনন্দ প্রকাশ করে।

গিরণারে আরও অনেক সাধু সজ্জনের আশ্রম আছে। ঠাকুর সদানন্দের আগমনে অনেকেই আনন্দে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন ও তাঁহার উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের উৎসাহে ও উদ্যোগে কিছু দিনের জন্য তথায় যেন এক সাধন বিদ্যালয় হইয়া যাইল। অনেকে তাঁহার নিকট বেদান্ত শাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন, কেহ কেহ যোগোপদেশ লইলেন। সদানন্দজী এই এই সময় একদিন হরিচরণকে বলিলেন—"তুমি আর এখানে থাকিয়া কি করিবে, তুমি বাড়ী যাও। অনেক দিন তুমি বাড়ী ছাড়িয়াছ, সংসারে তোমার জন্য সকলেই অত্যন্ত কাতর হইয়াছে, তাহা ছাড়া উপস্থিত তোমার সাধুসঙ্গের যোগও পূর্ণ হইয়াছে। তুমি যে সব তীর্থ

ও গুপ্ত-সাধন-ভূমি দর্শন করিলে, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে তাহা সহজ ব্যাপার নহে। তুমি এখন ঘরে যাও, তোমার মঙ্গল হইবে।" হরিচরণ এই কথা শুনিয়া অতি কাতরভাবে তাঁহার চরণে কত অনুনয় বিনয় করিল, কহিল—"প্রভু আমার প্রতি কেন বিরূপ হইতেছেন? আমার কোন অপরাধ হইলে নিজগুণে ক্ষমা করুন, আমার বাড়ী যাইতে আর সাধ নাই।" তিনি বলিলেন—"এখানের সাধুদিগের যেরূপ আগ্রহ দেখিতেছি, তাহাতে কিছুদিন এখানে আমায় থাকিতেই হইবে। উপস্থিত আর কোথাও শীঘ্র যাইবার ইচ্ছাও নাই, তুমি বৃথা এখানে বসিয়া থাকিয়া কি করিবে বল? সেখানে যাইয়া মায়ের মন্দিরে বসিয়াই তুমি অনায়াসে সাধন ভজন করিতে পারিবে। সংসারের সকলেও তোমায় পাইয়া যারপর নাই আনন্দ অনুভব করিবে, তুমি যাও। আর এক কথা, তোমাকে ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, বোধ হয় তোমার স্মরণও আছে, আমার কন্যাদের এখন পুত্রাদি হইয়াছে, তাহারা ক্রমে বড় হইয়াছে, তাহাদের সংবাদ দিও, তাহারা যেন কখনও আমার শ্রাদ্ধাদি না করে। আমার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া সাধারণতঃ আমার শ্রাদ্ধাদি করা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু আমি কৃতশ্রাদ্ধ-পিণ্ড, আমার এ দেহের অবসানেও আর শ্রাদ্ধ হইবে না। তাহাদের সহিত দেখা করিয়া বলিও আমার এ আদেশ তাহারা যেন চিরকাল পালন করে।" তাহার পর তিনি আরও কত কি কথা বলিলেন, তাহাকে সাধন বিষয়েও অনেক উপদেশ দিলেন।

হরিচরণ অগত্যা তাঁহার আদেশে অতিশয় ক্ষুন্নমনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। যথা সময়ে ৺কালীঘাটে তাহার বাটীতে

আসিলে, তাহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব তাহাকে পাইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল, কিন্তু হরিচরণ তাহার বাটীতে আর বাস করিল না। সে যতদিন বাঁচিয়াছিল, কালীঘাটে মায়ের মন্দিরের নিকট স্বতন্ত্র বাস করিত ও সর্ব্বদা সাধন ভজন লইয়াই থাকিত। সে সতত ঠাকুর সদানন্দের সম্বন্ধে নানা অলৌকিক ঘটনা ও তাঁহার কত অপূর্ব্ব উপদেশের কথা বলিত।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মৌনীবাবা।

ঠাকুর সদানন্দজী গিরণারে একটী সাধনপীঠ স্থাপন করিয়া স্বামী সচ্চিদানন্দের প্রতি তাহার পরিচালন ভার অর্পণপূর্ব্বক প্রায় দুই বৎসর পরে নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় কাশীতে আসিলেন। তখন ঠাকুর অঘোরানন্দ সবে মাত্র আপন আশ্রমে বসিয়া নিষ্কাম কর্ম্মের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বহু সাধু সন্ন্যাসী বেদান্তাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য মীমাংসা করিয়া লইতেছেন। আমাদের সন্ন্যাসীচরণ তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তিনি ভাগিনেয়কে সংসারী করিয়া, তাহারই উপর আপন স্ত্রী ও শিশু-পুত্রের ভার প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। চিন্তামণি ও কালীচরণ সংবাদ পাইয়া ঠাকুর অঘোরানন্দজীকে দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার উপদেশ লইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এ যাত্রা সংসার বন্ধন ছেদন করিতে পারিলেন না। সদানন্দদেব অঘোরানন্দজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন "ওঁ হং সঃ নমঃ শিবায়" বলিয়া পরস্পর অপার আনন্দে অভিবাদন করিলেন। সাধনা

সম্বন্ধে, বিশেষ পূজ্যপাদ ঠাকুরের সম্বন্ধে নির্জ্জনে উভয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। এখন হইতে শ্রীশ্রীপূজ্যপাদ ঠাকুরকে আমরা বৃদ্ধঠাকুর বলিয়াই উল্লেখ করিব। বৃদ্ধঠাকুর কখন কোথায় থাকেন, তাহার কিছুই ঠিক নাই, তিনি যে কে, তাহাও কেহ বলিতে পারেন না। অঘোরানন্দ ও সদানন্দ প্রভৃতির ন্যায় সিদ্ধ-সাধকগণ ব্যতীত সাধারণ সাধকবৃন্দ তাঁহার দর্শনও পান না। তিনি কখন কোথা দিয়া আসেন, কোথা দিয়া যান্, কেহই তাহা বলিতে পারেন না। অথচ জগতে তাঁহার অজ্ঞাত বিষয় কিছুই নাই। পাঠকের স্মরণ আছে, তিনিই সদানন্দজীকে তাঁহার সেই বাল্যকালে বিল্বমূলে প্রথম দেখা দিয়া এ যাবৎকাল যখন যেমন প্রয়োজন তেমনি শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। অঘোরানন্দজীও তাঁহারই আশ্রিত মহাপুরুষ। উপস্থিত পূজ্য-পাদ বৃদ্ধঠাকুরের আদেশেই তিনি কাশীতে আসিয়া উপদেশ দিতেছেন। বৃদ্ধ ঠাকুরের সম্বন্ধে তাঁহারা এইমাত্র বলেন যে, তিনিই দিব্যাচারী বা সাত্ত্বিক সাধকদিগের আদি-গুরু। কয়েক দিবস হইতে সদানন্দজী অঘোরানন্দ ঠাকুরের আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। একদিন একটী নবাগত সন্ন্যাসী আসিয়া সদানন্দ ঠাকুরকে ভক্তিভাবে অভিবাদন করিলেন। তিনিও তাঁহাকে আনন্দে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর জানিতে পারিলেন—অঘোরানন্দজীর নিকট তিনি বিরজা-সন্ন্যাস ও দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারই মুখে বৃদ্ধঠাকুরের শেষ আদেশ-বাণী শুনিয়া শীঘ্রই সংসারে ফিরিয়া যাইবেন। তিনি সংসারে থাকিয়া, গুপ্তাবধূত রূপে সংসারী সাধকগণকে সাধনার গুপ্ত উপদেশসমূহ প্রদান করিবেন। কারণ

দিব্য-সাধনার শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন, এমন গুরুর সংখ্যা অধুনা সংসারে অতীব হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। যাহাহউক তিনি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এতদিন অন্যত্র ছিলেন, আজ এখানে ফিরিয়া আসিয়াই সহসা ঠাকুর সদানন্দজীকে দেখিতে পাইয়া একাধারে চমৎকৃত ও অপার আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বহুদিন পরে কোনও পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সকলেরই এইরূপ আনন্দ হয়। সে কি আজিকার কথা, প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে সেই কালীঘাটে প্রথম দেখা, তাহার পর পাঁচজনে এক হইয়া কত তীর্থ পর্যটন, কত আনন্দ, শেষে উত্তরাখণ্ডে সেই পাহাড়ের বাঁকের মুখে সহসা অদর্শন! নবাগত সাধু সেই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে সদানন্দ ঠাকুরকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তিনি ধীরে ধীরে সকল কথার যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলেন। এ সাধুটী আমাদের সেই ভট্টপল্লী নিবাসী ব্রাহ্মণ-কুমার, যিনি শেষে চিন্তামণি ও কালীচরণকে সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। কালীচরণ ও চিন্তামণির ন্যায় তিনি সংসারের মায়ায় আবদ্ধ না হইয়া সাধনায় যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছেন; উপস্থিত ঠাকুর অঘোরানন্দের আদেশে তিনি পুনরায় সংসারে যাইবেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ-ঠাকুরের কৃপায় মায়া-রজ্জু তাঁহাকে আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। এখন হইতে সাধক-সমাজে তিনি গুপ্তাবধূত শ্রীমৎ বশিষ্ঠানন্দ ঠাকুর নামে পরিচিত হইলেন।

কয়েক দিবস সেই আশ্রমেই তাঁহারা আনন্দে কাটাইলেন, পরে ঠাকুর সদানন্দজী বঙ্গদেশাভিমুখে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, উভয়ে একত্র রহনা হইলেন। পথিমধ্যে একত্র

অবস্থানকালে সদানন্দজী গৃহী সাধকদিগের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে অনেক উপদেশাদি বলিয়া দিলেন, তিনিও অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আগ্রহসহকারে সেই সকল উপদেশ-বাণী শুনিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা কলিকাতায় পৌঁছিলে, সদানন্দজী তাঁহাকে ছাড়িয়া তাঁহার নিজ জন্মভূমি-দর্শনে যাইলেন. এবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ মধ্যম সহোদর শিরোমণি মহাশয়ের সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। চার পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে তিনি গঙ্গাতীরে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া "ওঁ গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" বলিতে বলিতে বহু আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু বান্ধব-পরিবৃত হইয়া পরোলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সেই শেষ সময়ে বরানগর মিলের তদানীন্তন ম্যানেজার সাহেব গঙ্গাতীরে তাঁহাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"শিরোমণি মহাশয় আপনি জ্ঞানী লোক হ'য়ে এই সব লোকজনের পরামর্শে কি পাগল হ'য়ে গেলেন? এঅবস্থায় কি কেহ কখন ঘাটে আসে? যান, আপনি বাড়ী যান।" তাহাতে তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"সাহেব, আর এ বাড়ী যেতে হবে না, আর আধঘণ্টা অপেক্ষা কর, সব দেখ্‌তে পাবে। আমি যেখান থেকে এসেছি ফের সেইখানেই ফিরে যাচ্চি।" সাহেব বহুদিন এই মিলের ম্যানেজাররূপে এখানে বাস করিতেছেন, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গ্রামে থাকিয়া বেশ বাঙ্গালা ত শিখিয়াছেন, তাহা ছাড়া হিন্দুদিগের শাস্ত্র সম্বন্ধেও তাহার বেশ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তিনি লোকও খুব ভাল, সকলের সহিত খুব মিশিতেন। গ্রামের বালক, বৃদ্ধ, এমন কি মেয়ে ছেলে পর্য্যন্ত সাহেবকে বেশ ভালবাসিত। সাহেব শিরোমণি মহাশয়ের কথায় কৌতুহল পরবশ হইয়া পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া

সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠিক আধ ঘণ্টা পরে তিনি সজ্ঞানে ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিলেন। সাহেব দেখিয়া ত অবাক! তাঁহার প্রতি পূর্ব্ব হইতেই সাহেবের বেশ শ্রদ্ধা ছিল, এখন তাঁহার এইরূপ স্বেচ্ছামৃত্যু দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে রুমাল দিয়া চক্ষু মুছিয়া মিলের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। ভাদ্রবধূ রাধারাণী ও তাঁহার আত্মীয়ারা বাড়ী ফিরিয়া যাইলেন। রাধারাণীর এখন আর কোন ভাবনা নাই। কখনও এখানে, কখন বা কন্যাদিগের বাটীতে, আবার কখন কখনও কোন তীর্থ-দর্শনে দিন অতিবাহিত করিতেন। নারায়ণ-শিলা ও অন্যান্য গৃহ-দেবতা যাহা ছিল, তাহা কন্যা ও অন্য এক আত্মীয়কে দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। সুতরাং ঠাকুর সদানন্দের আগমন সময়ে বাটীতে কেহই ছিলেন না। তিনি এবার আসিয়া সচ্ছন্দে জন্মভূমি দর্শন পূর্ব্বক সকলের অলক্ষে চলিয়া যাইলেন। কিছুদিন পরে তিনি আরও একবার কলিকাতায় আসিয়া ছিলেন, তাঁহাদের দৌহিত্রদের দেখিয়া তিনি পরিচিতের ন্যায় এমন অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন, যাহা তিনি ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। দৌহিত্রেরা সন্দেহপ্রযুক্ত তাঁহাদের পিতামহীকে ডাকিবার জন্য যেমন বাটির মধ্যে যাইলেন, অমনি তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। তখনই নিকটবর্ত্তী সমস্ত ধর্ম্মশালা ষ্টেশন আদি সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। এ সময়েও তিনি তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে কৌশলে নিষেধ আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর আবার অতীত হইয়া গেল, ঠাকুর সদানন্দ এতদিন যে কোথায় ছিলেন, কি করিতেছিলেন তাহার কোনও সংবাদই পাওয়া যায় নাই। তবে তিনি জ্ঞান ও উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া নিষ্কামভাবে জগতের সেবাধর্ম্মেই যে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নির্ব্বানাভিলাষী উচ্চ সাধকদিগকে উপদেশাদি দ্বারা সহায়তা করিয়া ও কোন কোন স্থানে নূতন সাধন-পীঠের সংস্থান করিয়া তিনি সাধকদিগকে সর্ব্বদা সহায়তা করিতেছেন। তিনি যে স্থানেই যখন থাকেন সেই স্থানই তখন যেন পূত নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়া যায়। কত যে সাধু সন্ন্যাসী তাঁহার দর্শন ও সিদ্ধ উপদেশবাণী শ্রবণের জন্য সমাগত হয় তাহার আর সংখ্যা নাই।

কয়েক দিবস গত হইল তিনি পুনরায় কাশীধামে আসিয়াছেন। কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে রাধাশ্রম নামক একটী অতি নিভৃত কাননের মধ্যে এক বৃক্ষমূলে একাকী বসিয়া থাকেন। সময় সময় কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সাধু তাঁহার নিকট আসিয়া উপদেশ গ্রহণ করেন মাত্র। তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ কিছু আহার্য্য আনিয়া দিলে তাহাই আহার করেন। প্রায়ই অন্য কোথায় যান্ না, তবে কদাচ কখন ইচ্ছা হইলে খুব ভোরে সকলের অগোচরে গঙ্গাস্নান করিতে আসেন মাত্র। সেই সময় ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ঠাকুর অঘোরানন্দজীর সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। তাঁহারাও কখন কখন তাঁহার নিকট আসিতেন। তাঁহাকে পাইলে তাঁহারা পরম পুলকিত হইয়া একান্তে পরস্পর ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেন। সে সময় কাষ্ঠজিহ্বা স্বামী, ঘর্ঘরানন্দ স্বামী ও ঝোলা ঝাবা প্রভৃতি সিদ্ধ সাধুগণ যাঁহারা কাশীতে অবস্থান

করিতেন, সকলেই তাঁহাকে অতি শ্রদ্ধার সহিত দেখিতেন। তাঁহার সেই নির্জ্জন নিভৃত বৃক্ষমূলে ক্রমেই বহু লোকের সমাগম হইতে লাগিল। সাধু, সন্ন্যাসী, বাবাজী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকই তাঁহার নিকট আসিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। তাহাতে সাম্প্রদায়িক ভাবের লেশমাত্রও ছিল না; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত তিনি তাঁহাকে সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়াই মনে করিতেন। দুই একটী ভক্ত গৃহী যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এক দিবস একটী মাড়োয়ারি মহাজন তাহার ব্যবসায়ে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মনের দুঃখে তাঁহার চরণে আসিয়া পড়িল, অতি কাতরভাবে তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিল। তিনি তাহাকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার মঙ্গল হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন। সেই দিন হইতে সে নিত্য তাঁহার দর্শন করিয়া যায়। দৈবানুগ্রহে আবার ধীরে ধীরে তাহার উন্নতি হইতে লাগিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, ঠাকুরের কৃপা-বলেই তাহার পুনরায় উন্নতি হইতেছে। সে প্রত্যহ নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী আনিয়া তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিত। তিনি সমাগত সাধুদিগের মধ্যে তাহা বিতরণ করিয়া দিতেন। এইভাবে কিছুদিন কাটিয়া গেল, সে ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বের অবস্থা অপেক্ষাও যথেষ্ট ঐশ্বর্য্যশালী হইল। সে ভাবিত, ঠাকুর সর্ব্বধনে-রই অধীশ্বর, তাঁহার কৃপা হইলে কাহারও কিছুই অভাব থাকে না। সেই কারণ সে ঠাকুরকে প্রায়ই "ধনেশ্বরানন্দ" বলিয়া অভিহিত করিত। অনেকের নিকট তিনি সে নামেও পরিচিত হইয়াছিলেন।

এক দিবস সেই মাড়োয়ারি মহাজন একটী রৌপ্য-নির্ম্মিত কমণ্ডলু, রূপার খড়ম ও একখানি ভালরূপ "ট্যান" করা সুন্দর বাঘছাল ও নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী, আরও কত কি লইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"এ সব কি হবে বাপু?" সে ব্যক্তি অতি বিনয় সহকারে বলিল "প্রভুর সেবার জন্য আনিয়াছি, আপনারই আশীর্ব্বাদে আমি অতুল সম্পদের অধিপতি হইয়াছি, আপনার সেবায় তাহার কিঞ্চিৎ ব্যয় না করিলে আমার আদৌ তৃপ্তি হইতেছে না, তাই যৎসামান্য আপনার প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিয়াছি, কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া দাসকে ধন্য করুন।"

ঠাকুর সদানন্দজী শুনিয়া বলিলেন—"বাবা আমি সন্ন্যাসী, বৃক্ষমূল আমার আসন, এ সব জিনিস কি আমার যোগ্য, আমি এ সকলও ব্যবহার করিব না, তুমি লইয়া যাও।"

সে নাছোড়বান্দা, কিছুতেই ছাড়িবে না, গ্রহণ করিতেই হইবে। তখন অগত্যা তিনি বলিলেন, "আচ্ছা তুমি এক কাজ কর, এ সব আজ তোমার ঘরে লইয়া যাও, এমন ফাঁকা জায়গায় এ সব মূল্যবান জিনিস পত্র রাখা ত সংগত নয়! আজ রাত্রে ভাবিয়া দেখি, কি করিয়া এ গুলি কোথায় রাখা যাইতে পারে। কি বল বাবা? সেই ভাল, তুমি আজ সব ঘরে লইয়া যাও, অন্য দিন আনিও, আর এ খাদ্যসামগ্রীই বা কি হইবে, এখানে ত কিছু রাখিবার জায়গা নাই, বিশেষ বেশী লোকজনও আজ আসে নাই, এ গুলিও আজ লইয়া যাও।" তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে। তিনি অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বিদায় করিলেন। সে ভাবিল বাবার ঘর বাড়ী নাই, বাস্তবিক এ সব জিনিস রাখিবেনই

বা কোথায় ? যাহা হউক বাবার জন্য একটী আশ্রম করিয়া দিতে হইবে। এই ভাবিতে ভাবিতে জিনিসগুলি লইয়া যেমন সে চলিয়া যাইল, তিনিও অমনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। দুই এক জন যাহারা নিকটে ছিল, তাহাদের কাহাকেও কিছু না বলিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে লুকাইয়া কোথায় চলিয়া যাইলেন, আর ফিরিলেন না। সে ব্যক্তি পরদিন আসিয়া দেখিল—তিনি নাই, কত লোককে জিজ্ঞাসা করিল, কেহই তাঁহার সন্ধান দিতে পারিল না। তখন মনের দুঃখে চারিদিকে তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিল নানা তীর্থে তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাইল। তাহার ভয় হইল, প্রভু আমার জন্যই বিরক্ত হইয়া আসন ছাড়িয়াছেন। তাঁহার কৃপায় আমি আজ এত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, আবার তাঁহারই বিরক্তির কারণ হইয়া নিশ্চয়ই সর্ব্বস্বান্ত হইব। চতুর্দ্দিকে সংবাদ পাঠাইল,—"যে ঠাকুরের সন্ধান করিয়া দিবে, আমি তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।" সেই লোভে অনেকে তাঁহার অনুসন্ধানও করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাঁহার কোনও সংবাদ দিতে পারিল না।

ঠাকুর ত কাশী ছাড়িয়া কোথাও যান নাই! সহসা যে এখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, তাহাও ত মনে হয় না! কেবল ঘোর স্বার্থপর সংসার-বিলাসী লোকগুলা সর্ব্বত্যাগী সাধুদিগের সেবা করিবার ছলে ধীরে ধীরে তাহাদের মনোমত নানা বিলাসের বস্তু আনিয়া তাঁহাদের উপভোগ করাইতে বাধ্য করে; তাহা দেখিয়াই ত সেই রাত্রিতেই অসীর দক্ষিণে শঙ্কট মোচনেরও কিঞ্চিৎ দক্ষিণে জনমানব বিবর্জ্জিত এক জঙ্গলের মধ্যে কয়েকটী বড় বড় গাছের অন্তরালে যাইয়া বসিয়া রহিলেন।

সে স্থানে কোন দিন কোন মানব কখনও যায় না, যাইলেও সে স্থানে রাত্রিবাস করিতে কেহ সাহস করে না, তবে তাহার কিছু দূরে শঙ্কটমোচনের নিকট যে সকল গোঁসাই সাধু বাস করেন তাঁহারা কখন কখন সেইদিকে নির্জ্জন দেখিয়া মলত্যাগ করিতে আসেন। ঠাকুর সেই পরিত্যক্ত নিভৃত ভূমিতে সমাধিমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার আর সাড়া শব্দ কিছুই নাই। ঠিক তাহার পরদিনই হউক বা দুই একদিন পরেই হউক একজন গোঁসাই সাধু সেই দিকে মলত্যাগ করিতে আসিয়া দেখেন, বৃক্ষমূলে মানুষের মত যেন কে বসিযা আছে। এমন স্থানে যে, কোন মানুষ এমনভাবে বসিয়া থাকিবে, সহসা তিনি তাহা বিশ্বাস করিতেই পারিলেন না। নিকটে যাইয়া দেখেন, ঠাকুর ধনেশ্বরানন্দ বসিয়া সমাধিমগ্ন হইয়া আছেন। তাঁহাকে সকলেই প্রায় চিনিত, সেই গোঁসাইও দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। কিন্তু এমন কদর্য্য স্থানে তাঁহার সহসা আগমনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ঠাকুরের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া তাঁহার নিকট স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে যখন তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল, তখন তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া এমন স্থানে তাঁহার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু ঠাকুর মুখে কোনও কথা বলিলেন না, ভাবে প্রকাশ করিলেন— "এখানেই এখন থাকিব, কাহাকেও একথা বলি ও না।" তিনি সেই দিন হইতেই মৌনী হইয়া রহিলেন। গোঁসাইজী ভাবিলেন, ঠাকুর আর কথা কহিবেন না। তাঁহার বসিবার স্থানের চারিধার তিনি স্বহস্তে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিলেন, এক 'ডোল' জল আনিয়া সেখানে রাখিয়া দিলেন। আর একটী

দরিয়া নারিকেলের কমণ্ডলুতেও জল ভরিয়া তথায় রাখিয়া দিলেন। গোঁসাইজী নিত্য ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহাই তাঁহাকে আহার করাইয়া যাইতেন। এই ভাবেও এক বৎসর কাল কাটিয়া গেল, কেহই তাঁহার সন্ধান পাইল না। ক্রমে সেই গোঁসাইয়ের পরিচিত দুই একজন মাত্র সাধু তাঁহার সন্ধান পাইয়া সেস্থানে আসিতে লাগিলেন, কিন্তু ঠাকুর আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। সুতরাং এখানে তিনি ক্রমে মৌনীবাবা বলিয়া পরিচিত হইলেন। এ দিকে সেই মাড়োয়ারী মহাজন অবিরত অনুসন্ধানের ফলে সাধুদিগের নিকট একদিন তাঁহার সংবাদ পাইয়া তখনই তাঁহার চরণতলে আসিয়া পতিত হইল ও অতি কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। সে আর তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবে না বলিয়া পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিতে লাগিল। কিন্তু ঠাকুর যেন অচল পাষাণমূর্ত্তি, তিনি ত পূর্ব্ব হইতেই মৌনী ছিলেন ; সুতরাং কোন কথা ত বলিলেনই না, পরন্তু কোনও ভাবও প্রকাশ করিলেন না। সে সেইদিনই হইতে আবার নিত্য আসিতে লাগিল, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অনন্তর সেই বৃক্ষের নিকটেই একটী গুহা প্রস্তুত করিয়া দিল। ঠাকুর তাহার মধ্যেই অধিকাংশ সময় সমাধিতে থাকিতেন। আর কাহারও সহিত তাঁহার প্রায় দেখা সাক্ষাৎ হইত না। ভক্ত সাধু ও গৃহস্থগণ নিত্য তাঁহার গুহার দ্বারে আসিয়া প্রণাম করিয়া যাইত। তিনি যে দিন গুহামধ্য হইতে বাহির হইতেন, সেইদিন কিছু দুধ মিষ্টান্ন ও জল গ্রহণ করিতেন। সেইদিনই ঘটনাক্রমে কেহ তথায় উপস্থিত থাকিলে তাঁহার দর্শন পাইত। পূর্ব্বোক্ত গোঁসাইদের

মধ্যে কেহ না কেহ সর্ব্বদাই তথায় উপস্থিত থাকিতেন। এই-ভাবেও তিনি তথায় অনেকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

একদিন তাঁহার মনে হইল, তিনি গুহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইলেন। পথে তাঁহার সঙ্গে অনেক সাধু জুটিয়া গেল, তাঁহাদের সঙ্গে তিনি পদব্রজে হরিদ্বারের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সঙ্গী সাধুরা তাঁহার সহিত যথাসময়ে হরিদ্বারে পৌছিয়া তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে একটী আশ্রমের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তিনি তথায় সর্ব্বদা আত্মানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। একদিন সমাধিভঙ্গের পর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, তখনও আসন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উঠিবার ইচ্ছা হয় নাই, বেশ যেন একটু ভাবে গদগদ হইয়াছেন, সহসা সম্মুখে দেখিলেন, ভৈরবীমা আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া বলিয়া উঠিলেন "মা এসেছ?" কতদিন পরে আজ মৌনীবাবার মৌনব্রত ভঙ্গ হইল। তাঁহার মুখে শিশুর ন্যায় সুমধুর 'মা' নাম আপনা আপনি যেন ফুটিয়া উঠিল। ভৈরবীমা বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা, এসেছি। ঠাকুর (বৃদ্ধ ঠাকুর) এতদিন পরে তোমার সগুণ মূর্ত্তি দেখাইলেন।" উভয়ে উভয়কে প্রণাম করিলেন, কিন্তু পরস্পর কেহ কাহাকেও কোন কুশলাদি বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন না। ভক্ত সাধুরা ঠাকুর সদানন্দের ইঙ্গিতে সকলে সেস্থান হইতে সরিয়া গেল। তাঁহারা নির্জ্জনে কত কি আলাপ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মা বলিলেন—"বাবা, চল স্নান করিতে যাই! ঠাকুরের আজ্ঞা পালন করি!" সদানন্দজী উত্তরে কহিলেন—"বেশ, আমিত প্রস্তুত হইয়াই আছি মা!" উভয়ে ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে চলিলেন।

সকলে স্পষ্ট দেখিল, তাঁহারা দুইজনেই কুণ্ডে অবতরণ করিলেন, কিন্তু ঠাকুর সদানন্দকে কেহই আর উঠিতে দেখিলেন না, কেবল ভৈরবীমা একেলা উঠিয়া "ভীমঘোরার" দিকে চলিয়া যাইলেন। ভক্ত সাধু সন্ন্যাসীরা বুঝিল ঠাকুর সদানন্দের আজ চির সমাধি হইল। লোকমুখে ক্রমে সেই কথাই প্রচার হইল। কাশীবাসী ভক্তজন যখন এ সংবাদ শুনিলেন, তখন সকলেই হায় হায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি দেহত্যাগ করেন নাই। তিনি ভৈরবীমার পূর্ব্বেই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কি জানি কেমন করিয়া তিনি যাইলেন, কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। ভৈরবীমা পরক্ষণেই তাঁহার অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহারা কোথায় যে যাইলেন, লোক-লোচন তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কৈলাসপুরী।

আজ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, শ্রীশ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য দেবের প্রতিষ্ঠিত গঙ্গোত্তরীস্থ শ্রীশ্রীগঙ্গাদেবীর পট খুলিয়াছে, পূজা-পাঠ আরম্ভ হইয়াছে। দুই চারিজন সাধু সন্ন্যাসী ও পাণ্ডারা মাত্র সবে আসিয়াছে। পথ ঘাট মন্দির এখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় নাই। প্রাতঃকাল, সূর্য্যদেবের সম্পূর্ণ প্রকাশ হইতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে, উষার ঘোর ঘোর ভাব এখনও সব যায় নাই, চারিদিকে কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন, সুতরাং দূরের বস্তু স্পষ্ট পরি-

লক্ষিত হয় না। এক অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, নগ্নদেহ, লোলচর্ম্ম, কেশ ও শ্মশ্রু রজতসদৃশ শুভ্র, একগাছি দীর্ঘযষ্টি হস্তে, সুমধুর গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে সেই বরফানির উপর দিয়া নিম্নে নামিতেছেন। কাহারও দিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, আপন মনে আসিয়া তিনি সেই বরফগলা গঙ্গাজলে অবলীলাক্রমে অবগাহন করিলেন, তাহার পর সেই ভাবেই গঙ্গাদেবীর মন্দিরের মধ্যে ঢুকিয়া দেবী দর্শন করিলেন ও অনতিবিলম্বে তথা হইতে বাহির হইয়া তিনি পুনরায় উপরে উঠিতে লাগিলেন। তীর্থদর্শনার্থী একজন সাধু তাঁহার এইরূপ অসাধারণ ভাব দেখিয়া কৃপালাভের আশায় তাঁহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু সেই বৃদ্ধের সহিত চলা তাঁহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন, তথাপি প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর উঠিবার পর বৃদ্ধ মহাপুরুষ একটু দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া সেই অনুসরণকারী সাধুকে হস্ত সঞ্চালন দ্বারা নামিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু সাধু অবসর বুঝিয়া আরও দ্রুতভাবে যাইয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন ও অনুনয় বিনয় করিয়া কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা তখন দৃঢ়ভাবে বলিলেন "মারা যাইবে পালাও।" সাধু তাঁহার চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—'মরি ত আপনার চরণতলেই মরিব, মরণে আর ভয় কি বাবা! মরিবার জন্যইত জন্ম হইয়াছে, যদি জন্মিয়া এতদূর আসিয়া, আপনার দর্শন পাইয়াও আপনার কৃপাই না পাইলাম, তবে আর আমার বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? যখন কৃপা করিয়া অধমকে দেখা দিয়াছেন, তখন আর চরণে ঠেলিবেন না ঠাকুর।"

বৃদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহার এইরূপ ঐকান্তিকতা দেখিয়া আর কোন কথা না বলিয়াই ত্বরিত তাঁহার স্কন্ধ হইতে উত্তারয বস্ত্র লইয়া ছিঁড়িয়া তাঁহার চক্ষু দুইটী বাঁধিয়া দিলেন ও হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বৃদ্ধ তাঁহার হাতখানি ধরিবামাত্র তাঁহার বোধ হইল যেন তিনি পাখীর মত হালকা হইয়া যাইলেন, আবও বোধ হইল তিনি যেন শূন্যে উড়িয়া যাইতেছেন, পদতল বুঝি আর ভূমিস্পর্শ করিতেছে না। কতক্ষণ যে এইভাবে চলিলেন, তাহা তিনি কিছুই স্থির কবিতে পারিলেন না। একস্থানে বৃদ্ধ তাঁহার আবদ্ধ চক্ষু খুলিয়া দিলেন। তখন তিনি দেখিলেন একটী প্রকাণ্ড গুহাব দ্বার, তাহার মধ্যে লোক-জনের চিহ্নমাত্রও নাই, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কিন্তু কোথা হইতে কি যেন মধুর গুণ্ গুণ্ অস্পষ্ট শব্দ হইতেছে। বেশ স্থির হইয়া শুনিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। গুহার বাহিরে কেবল বরফ উপর ন'চে আশে পাশে দূরে নিকটে কেবল বরফ, ববফ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গাছ পালা পাখী পক্ষী কিছুই নাই। বৃদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহাকে সেই স্থানে বসিতে বলিয়াই ভিতরের দিকে কোথায় চলিয়া যাইলেন। ইতি মধ্যে আসিবার সময় একবার শীতে তাঁহার শরীরের সমস্ত রক্ত যেন জমিয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল, কিন্তু গুহার মধ্যে সে ভাবের কিছুই নাই, তাঁহার গায়ের উত্তরীয় কম্বল আদি সব যেন তখন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তিনি কেবল কৌপীন মাত্র পরিধান করিয়াই সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে তথায় বসিয়া রহিলেন। দুই প্রহর অতীত হইয়া গেল, সে বৃদ্ধ মহাপুরুষ তখনও ফিরিলেন না। তিনি একাকী বসিয়া কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময়

সহসা কোথা হইতে শঙ্খ ঘণ্টা ও ডমরু আদি বাজিতে লাগিল, গুহার মধ্যে কি বাহিরে তাহা তিনি আদৌ স্থির করিতে পারিলেন না। কখন বোধ হইল যেন সে শব্দ অতি নিকটে তাঁহার পার্শ্ব হইতেই আসিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সহস্রকণ্ঠে যেন ববম ববম্‌ শব্দে গুহার অন্তর বাহির প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, ধুপ দীপ চন্দনের অতি সুমধুর পবিত্র গন্ধ পূর্ব্ব হইতেই আসিতেছিল। এখন তাহা যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া চারিদিক আমোদিত করিয়া তুলিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "এ কোন পুরী, কোথা হইতে এ সকল শব্দ গন্ধাদি আসিতেছে? কিছুই ত পরিলক্ষিত হইতেছে না, কোন মূর্ত্তিও ত দেখিতেছি না? সে মহাত্মাইবা কোথায় গেলেন? হায় আমি হতভাগ্য, আমার পাপ নয়ন কিছুই প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছে না।" কিয়ৎপরে সে শব্দাদি ক্রমেই যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল, আর সে কোলাহল নাই, আবার চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল। সেই গভীর নিস্তব্ধতা বরফানির সহিত বুঝি জমাট বাঁধিয়া গেল। কেবল কি এক অপূর্ব্ব সৌরভ মৃদুমন্দ বায়ু হিল্লোলে প্রাণমন মোহিত করিয়া তুলিল। তিনি এমন অবস্থায় আর কি করিবেন—আপন মনে তখন ইষ্টচিন্তা করিতে লাগিলেন, আর একান্তভাবে মনে মনে শ্রীনাথচরণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—"ঠাকুর, আপনার আশীর্ব্বাদে যখন এমন স্থলে আসিতে পারিয়াছি, তখন আর ফিরাইবেন না প্রভু, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" ইতিমধ্যে সেই মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"বাবা তুমি একান্তই ছাড়িলে না, কি করিব? কিন্তু এখনও তোমার সময় হয় নাই। তবে তোমার পূর্ব্বজন্মের বহু সাধনার ফলে এ

তোমার গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে দেবতার আরতি ও আনন্দ কোলাহল শুনিতে পাইয়াছ। নাও এখন প্রসাদ গ্রহণ কর।” সাধু যুক্তকরে প্রসাদ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু এ কোন স্থান ?” মহাত্মা উত্তবে বলিলেন “পরে জানিতে পারিবে বাবা ব্যস্ত হইও না। আমাব সঙ্গে এখন এস, কিন্তু কোন কথা কহিও না।” এই বলিয়া তিনি আগে আগে চলিলেন, সাধুটী তাঁহারই পিছনে যাইতে লাগিলেন। গুহার মধ্যে কিয়দ্দূর যাইবার পর একটী সোপান পথে নামিয়া সম্মুখেই একটী ক্ষুদ্র গুহা দেখাইয়া তিনি বলিলেন, “তুমি এ স্থানে থাক, পার্শ্বে ঝরণা আছে, জল পান কর। আর যাহা কিছু তোমার প্রয়োজন সমস্তই এই গুহার মধ্যে আছে, পাইবে। আমি এখন যাই, আবার সন্ধ্যার পর দেখা হইবে।”

সাধু তাঁহার আদেশমত সেই গুহায় বসিয়া প্রসাদ ও জল পান করিলেন। সন্ধ্যার পর মহাত্মাজী আসিয়া তাঁহাকে এক মন্দির প্রাঙ্গণে লইয়া যাইলেন। তথায় দেবকান্তি বিশিষ্ট কয়েকজন মহাপুরুষ স্ব স্ব আসনে বসিয়া ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। সাধু সকলকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন ও ভূমিতলে বসিয়া করযোড়ে তাঁহাদের অপূর্ব্ব কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। আর সেই বৃদ্ধ মহাপুরুষ তাঁহাদের পার্শ্বে স্বতন্ত্র আর একখানি আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন “সিদ্ধবাবা, আজ আপনি গঙ্গোত্তরী স্নান করিতে যাইয়া এই সাধুটীকে পাইয়াছেন ? এটী যে অঘোরানন্দ দাদারই শিষ্য দেখিতেছি ! তিনি আজও সমানভাবে মুমুক্ষু জীবদেবতার পূজা করিতেছেন। ধন্য তাঁহার জীবব্রহ্মের সেবা-তৎপরতা !” সাধু

এমনস্থলে তাঁহার গুরুদেবের নাম শুনিয়া তাঁহাকে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। সেই মহাত্মা আবার বলিলেন—"রামানন্দ, তোমার ঠাকুরকে আমাদের নমোনমঃ কহিও! আর বলিও আপনার সদানন্দভায়া এখন সদানন্দেই আছেন, তবে বৃদ্ধ-ঠাকুরের আদেশে আপনার ন্যায় জীবব্রহ্মের সেবা করিতে না পাইলেও, সততঃ দেব-ব্রহ্মের সহিত শিবব্রহ্মের সেবায় নিরত রহিয়াছেন। তুমি সিদ্ধ-বাবার নিকট এ স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? এ স্থানের নাম কৈলাসপুরী। ঐ দেখ, ঐ যে রজতশুভ্র গিরিশৃঙ্গ দেখিতেছ, ঐ স্থানেই দেবাদিদেব শ্রীমৎ শঙ্কর শ্রীমতী শঙ্করী গৌরীদেবী-সহ অবস্থান করেন। তোমার এখনও সে সময় হয় নাই বাবা, সেই কারণ সূক্ষ্মতম পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। তবে এই জন্মেই তুমি শিব-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। তোমার ঐকান্তিক ইচ্ছা, পূর্ব্বজন্মের সাধনা এবং অচঞ্চল গুরু-ভক্তির ফলেই পূর্ব্বাহ্নে কৈলাসের এ সূক্ষ্মতর দেবভূমি দর্শন করিতে পাইলে। তুমি সিদ্ধবাবাকে প্রণাম কর।"

সাধু সিদ্ধবাবা ও অন্যান্য সকল মহাত্মাকেই পুনরায় ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। এই সময় ভৈরবীমা আসিয়া বলিলেন—"বাবা, তোমরা সকলে চল, আরতির সময় হইয়াছে।" বলিতে বলিতে আবার পূর্ব্বের ন্যায় শিঙ্গা ডমরু শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, সকলে সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। তিনি এই সকল দৈবীভাব দেখিয়া অবাক হইয়া যাইলেন। সেই স্থানে একা বসিয়া রহিলেন ও একাগ্রভাবে মনে মনে গুরু-পাদুকা চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই ঘণ্টাদির বাদ্য, সেই দিব্যগন্ধ, সেই মৃধুমন্দ পবন-হিল্লোল, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাকিরণে আরও কত মধুময়

বোধ হইতে লাগিল। উদাত্তাদি স্বরে ববম্ ববম্ গালবাদ্য, সে যে কি অপূর্ব্ব স্বর-লহরী, তাহা বুঝাইবার ভাষা নাই। সদানন্দ ঠাকুরের প্রদর্শিত সেই গিরিশৃঙ্গটীর প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, দেখিলেন—যেন তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল ও বিরাট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু সে যে কত দূরে বা কত নিকটে তাহা তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কখন মনে হইতেছে, তাঁহার সহিত শৃঙ্গটীর অনন্ত ব্যবধান, আবার পরক্ষণেই মনে হইতেছে, তাহা কেন? তিনি যে তাহারই পাদমূলে বসিয়া সমস্ত প্রত্যক্ষ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তিনি তন্ময় হইয়া যাইলেন, তখন কি এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ সহসা ফুটিয়া উঠিল, তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাই-লেন—অনুপম কল্পবৃক্ষমূলে দিব্য রত্নবেদীকার উপর পারদসদৃশ শুভ্রোজ্জ্বল অপূর্ব্ব-কান্তি দেবাদিদেব শ্রীশ্রীশঙ্কর শ্রীমতী পার্ব্বতী-সহ পরমানন্দে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, চারিদিকে নানা দেবতা বিবিধ উপচারে তাঁহাদের আরত্রিকাদি সম্পন্ন করিতেছেন। কত দেবোপম মহাত্মা কত মহাপুরুষ করযোড়ে গৌরীশঙ্করের কত স্তব স্তুতি করিতেছেন। আহা, সে কি মনোরম ভাব। জ্যোৎস্নাপুলকিত কৈলাশপুরীর চারিদিকে কত অসংখ্য জাতীয় সুগন্ধ পুষ্পকুঞ্জ, তাহার চারিদিকে মধুপকুল কেমন গুঞ্জন করি-তেছে, কত বিশাল বৃক্ষশ্রেণী সুধারসপূর্ণ সুমধুর ফলভারে অবনত, তাহাতে শত সহস্র বিচিত্র বিহঙ্গ সদা হ্রীঁ হোঁ স্বরে আকাশ-প্রাঙ্গন মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার অন্তর-বাহ্যের সকল জ্ঞান রহিত হইয়া যাইল, ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞাও লোপ পাইল। এইভাবে কতক্ষণ যে, কাটিয়া যাইল, তিনি

তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। অনন্তর স্বপ্নযোগে তিনি স্পষ্ট দেখিলেন—সেই বৃদ্ধ মহাত্মা বা সিদ্ধবাবা, ঠাকুর সদানন্দ ও ভৈরবীমা তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। ভৈরবীমা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিলেন, তিনি ভক্তিভরে হাত পাতিয়া তাহা লইলেন। ঠাকুর সদানন্দ বলিলেন—"রামানন্দ, তোমার দৃঢ় গুরুভক্তির ফলস্বরূপ যাহা দর্শন করিলে, তাহা কাহারও সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। এখন তুমি তোমার গুরুদেবের নিকট পুনরায় ফিরিয়া যাও। তাঁহার নিকট সাধনার শেষ জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ উপযুক্ত হও। তাহা হইলেই পুনরায় এখানে আসিতে পারিবে। পূজ্যপাদ সিদ্ধবাবার কৃপায় তুমি এখানে আসিতে পারিয়াছ, ইহাকে প্রণাম কর, আর এই ফলটী যত্ন করিয়া রাখিয়া দাও।" ভৈরবীমাকে বলিলেন—"মা, আপনিও আশীর্ব্বাদ করুন, প্রিয়তম রামানন্দ যেন সিদ্ধি লাভ করে।" রামানন্দ সকলকে প্রণাম করিলেন, সকলে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। এমন সময় তাঁহার সেই স্বপ্নভাব ভঙ্গ হইল, তিনি চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে কেহই নাই, তিনি গঙ্গোত্তরীর এক ধর্ম্মশালায় শুইয়া আছেন। কি এক অপূর্ব্ব ফল তাঁহার হাতে রহিয়াছে। তিনি ফলটী ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলেন, তাহা কতকটা সুপুষ্ট আমলকিরই মত; কিন্তু আমলকি অপেক্ষা অনেক বড়। যাহাহউক তিনি শুইয়া শুইয়াই এই সব দৈবী ব্যাপার ভাবিতে লাগিলেন ও শ্রীগুরুর পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তাহার পর অনেকদিন অতীত হইয়া গিয়াছে, তিনি উত্তরাখণ্ড ও হিমালয়ের অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়া ৺কাশীধামে

নিজ গুরুদেবের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার চরণে প্রণতঃ হইয়া ঠাকুর সদানন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে সকল কথা নিবেদন করিলেন এবং সেই ফলটী তাঁহার গুরুদেবকে দিলেন। ফলটী তখনও অবিকৃত ছিল। ঠাকুর অঘোরানন্দজী রামানন্দের মস্তকে হাত দিয়া বলিলেন—"বাবা, ইহা অতি দুর্লভ বস্তু; ইহাকেই সিদ্ধি-ফল বলে। ঠাকুর সদানন্দের কৃপায় তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি ধন্য! ইহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখ, তুমি অনতিবিলম্বেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।" রামানন্দ গুরুদেবকে পুনরায় প্রণাম করিয়া ফলটী তুলিয়া নিজের মস্তকে স্পর্শ করাইলেন ও মনে মনে ঠাকুর সদানন্দ প্রভৃতিকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন।

সাধু রামানন্দজীর মুখেই কৈলাসের দেবভূমিনিবাসী ঠাকুর শ্রীমৎ সদানন্দ দেবের এই শেষ সংবাদ শুনা গিয়াছে। তিনিও এখন গুরুর কৃপায় কৈলাস লাভ করিয়াছেন। ঠাকুর অঘোরা-নন্দ দেব তৎপূর্ব্বেই পূজ্যপাদ বৃদ্ধ-ঠাকুরের আদেশে কৈলাস যাত্রা করিয়াছেন। স্বামী সচ্চিদানন্দজী অধুনা খুবই বৃদ্ধ হইয়া-ছেন, তিনি এখনও গিরনারের সেই গুহাতেই আছেন। কখন কখনও তাঁহার শিষ্যবর্গের কল্যান-কামনায় কাশী, কলিকাতা ও অন্যত্রও গমণ করিয়া থাকেন। শুনা যায়, তাঁহার দ্বাররক্ষক বিজয়া এখনও জিবীত আছে। পর্ব্বত-আরোহণের সময় বিজয়া এখনও স্বামীজীকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যায়। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কেহ এখনও তাহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

সন্ন্যাসীচরণ বহুদিন পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কালীচরণ, চিন্তামণিও আর নাই। গত সন ১৩২২ বঙ্গাব্দের শ্রাবণী-পূর্ণিমায় পূজ্যপাদ ঠাকুর শ্রীমৎ বশিষ্ঠানন্দদেবও একশতা-

'শিল্প ও সাহিত্য' পুস্তক বিভাগ হইতে প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী—

সচিত্র-কাশীধাম (দ্বিতীয় সংস্করণ) বহুতর চিত্রাদি সমন্বিত হিন্দুর পুণ্যতীর্থ 'কাশী' তথা 'বারাণসী'র প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত।

ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের সংস্থাপক, আচার্য্য-প্রবর শ্রীযুক্ত **মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী** সাহিত্যকলাবিদ্যার্ণব প্রণীত এবং পরমহংস স্বামী শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, মহারাজজী কর্ত্তৃক আমূল সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত প্রায় পৌনে চারিশত পৃষ্ঠাপূর্ণ ও ৩৬ খানি অতি সুন্দর ও অপূর্ব্ব চিত্র শোভিত বিরাট গ্রন্থ। বিলাতি বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

"সচিত্র-কাশীধাম"—সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(**বঙ্গবাসী**)—"গ্রন্থকার-মহাশয় সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। ইনি সুশিল্পী। সাহিত্যে ভাষায় ও বর্ণনায় ইহার রচনা-শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ৺কাশীধাম সম্বন্ধে ইনি অভিজ্ঞ। "গ্রন্থের আদ্যন্তে ভক্তির পরিচয় সুতরাং এ গ্রন্থ কেবল ভক্তির হিসাবে ভক্তের নহে, সাহিত্যহিসাবে সকলেরই পাঠ্য।"

(**বসুমতী**)—"***এ গ্রন্থ ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্, পুরাবস্তু-অনুসন্ধিৎসু, তীর্থযাত্রী প্রভৃতি সকলেরই উপকারে আসিবে। (**হিতবাদী**)—"কাশীযাত্রিগণ এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন।" (**মেদিনীপুরহিতৈষী**)—"*** কাশীর বহু অনাবিষ্কৃত তথ্য আবিষ্কার করিয়া ইহা প্রচার করিয়াছেন।

'শিল্প ও সাহিত্য' পুস্তক বিভাগ হইতে প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী—

সচিত্র-কাশীধাম (দ্বিতীয় সংস্করণ) বহুতর চিত্রাদি সমন্বিত হিন্দুর পুণ্যতীর্থ 'কাশী' তথা 'বারাণসী'র প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত।

ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের সংস্থাপক, আচার্য্য-প্রবর শ্রীযুক্ত **মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী** সাহিত্যকলাবিদ্যার্ণব প্রণীত এবং পরমহংস স্বামী শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী, মহারাজজী কর্ত্তৃক আমূল সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত প্রায় পৌনে চারিশত পৃষ্ঠাপূর্ণ ও ৩৬ খানি অতি সুন্দর ও অপূর্ব্ব চিত্র শোভিত বিরাট গ্রন্থ। বিলাতি বাঁধাই মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

"**সচিত্র-কাশীধাম**"—সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত:—

(**বঙ্গবাসী**)—"গ্রন্থকার মহাশয় সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। ইনি সুশিল্পী। সাহিত্যে ভাষায় ও বর্ণনায় ইঁহার রচনা-শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ৺কাশীধাম সম্বন্ধে ইনি অভিজ্ঞ। "গ্রন্থের আদ্যন্তে ভক্তির পরিচয় সুতরাং এ গ্রন্থ কেবল ভক্তির হিসাবে ভক্তের নহে, সাহিত্যহিসাবে সকলেরই পাঠ্য।"

(**বসুমতী**)—"***এ গ্রন্থ ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্, পুরাবস্তু-অনুসন্ধিৎসু, তীর্থযাত্রী প্রভৃতি সকলেরই উপকারে আসিবে। (**হিতবাদী**)—"কাশীযাত্রিগণ এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন।" (**মেদিনীপুরহিতৈষী**)—"*** কাশীর বহু অনাবিষ্কৃত তথ্য আবিষ্কার করিয়া ইহা প্রচার করিয়াছেন।

(কাজেরলোক)—"*** এমন গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই। ** একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। (সাহিত্য-সংবাদ)—"*** ইহা পাঠে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়, বিষয়-বিন্যাস কৌতূহল-প্রদ।" *** (ব্রহ্মবিদ্যা) "যিনি বহু বৎসর কাশীতে বাস করিয়া স্থানীয় তথ্য সকল নিজে আয়াসসহ অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা যে অন্যদৃষ্ট ও অন্য-লিখিত বিবরণের অনুবাদাদি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য ও সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। এই পুস্তকে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ের অভাব দেখিলাম না। ***" (বঙ্গবাণী)—"** এককথায় ইহা কাশীর ইতিহাস ও কাশীযাত্রার "গাইড-বুক"। ***

("THE BENGALI," 3-11-12)— The book is full of valuable information about the sacred city—information which we believe would be both interesting and instructive to all lovers of antiquity and particularly to patriotic Hindus." ("INDIAN DAILY NEWS" 10-9-12)—"This is an illustrated guide book to Benares in Bengali ***which cannot fail to be of use to Bengali pilgrims to that Holy City." ("AMRITA BAZAR PATRIKA" 7-10-12)—"***The reader will find in the book detailed descriptions of not only all the temples, wells, ghats, muths, mosques, and other relics of antequarian interest but also of all the modern institutions which have added lustre to the fair fame of the fascinating city. There are also in the book • elaborate accounts of the various

religious sect with their institutions, that have established themselves in the city. The book contains various illustrations. ***In the accounts which the learned author has given, he has left nothing unsaid and the most minute objects of interest have not escaped his observant eye. The language is chaste, lucid and dignified, and the the general get-up of the book excellent.*** ("THE TELEGRAPH")—"**A topographical review of Kasi and its surroundings. When we say topographical we do not imply thereby that he has written only notes on the Holy City as regards its geography but an exhaustive and interesting history, social, religious and political, of Benares with minute description and accounts of places of interest. ***It has one great attraction, we mean, it never tries the patience of readers ; we think it is valuable as a book of reference and useful to all intending pilgrims to the Holy City."

'পেণ্টিং' বা চিত্র-শিল্প বিষয়ক অপূর্ব্ব গ্রন্থ, সৎসাহিত্যের ন্যায়ই সকলের পাঠ্য ও উপভোগ্য।

ইহাও উক্ত আচার্য্য-প্রবর প্রবীন সাহিত্যিক সাহিত্যকলা-নিধার্ণব মহাশয় প্রণীত একখানি অসাধারণ পুস্তক। মূল্য—বিলাতি বাঁধাই ১৲ টাকা মাত্র।

'বর্ণ-চিত্রণ'-সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত :—

(**বঙ্গবাসী**)—"কেবল চিত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞতা থাকিলে, গ্রন্থ-রচনা হয় না, সাহিত্য-রচনায় শক্তি থাকা চাই। শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাহিত্য-রচনায় চিরকুশল। তুলিকায় যে ছবি উঠে, লেখনীতে তাহা ফুটাইতে হইলে, সাহিত্য-রচনা-শক্তির প্রচুর প্রয়োজন হয়। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দুই শক্তিই দীপ্তিময়ী। এই আলোচ্য-গ্রন্থ চিত্রসম্বন্ধে আদর্শ-গ্রন্থ হইয়াছে। চিত্রবিদ্যায় যাঁহাদের ঝোঁক, তাঁহাদের কাছে ইহার আদর ত হইবেই, সাহিত্য-হিসাবেও প্রত্যেক বাঙ্গালীর ইহা আদরণীয়। এক কথায় বলি, বাঙ্গালায় এমন গ্রন্থ নাই বলিলেও, বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না।" (**ব্যবসায়ী**)—"***সকলকেই এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।" (**এডুকেশন গেজেট**)—"এরূপ পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রথম। ভারতীয় শিল্পকলার সঞ্জীবনের ইতিহাসে এই পুস্তকখানি ভবিষ্যতে স্মরণীয় হইবে। *** গ্রন্থকার শ্রেষ্ঠশ্রেণীর লোক।**" (**সাহিত্য-সংবাদ**)—"*** গ্রন্থখানিকে প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের চিত্রবিদ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' বলিলেও বলা যাইতে পারে। চিত্রশিক্ষার্থী এই পুস্তকের সাহায্যে চিত্রশিক্ষার বহু তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। বাঙ্গালা ভাষায় এ শ্রেণীর পুস্তক বিরল। প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবম্বিধ গ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গালা-সাহিত্যের এক দিকের বিশেষ অভাব পূরণ করিতেছেন।***" ("THE TELEGRAPH")

"***The learned author has very elaborately dwelt

উপাদেয় উপহার পুস্তক। (দ্বিতীয় সংস্করণ) আমূল সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। মূল্য-বিলাতি বাঁধাই ॥০ আট আনা মাত্র।

'ঠাকুরমা' সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত ঃ

(**বঙ্গবাসী**)—"গ্রন্থকার বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে সুপরিচিত। বাঙ্গালা পাঠক ইহার লিপিপটুতার পরিচয় পাইয়াছেন। সাহিত্যের রচনায় ইহার শিল্প-নৈপুণ্য উজ্জ্বল। এখানকার অনেক মেয়ে, শিক্ষা ও সদুপদেশের অভাবে, পরন্তু কু-শিক্ষার প্রভাবে বিগড়াইয়া যায়। ঠাকুরমার শিক্ষাপ্রভাব কমিতেছে পাশ্চাত্য হাওয়ার তেজ বাড়িতেছে, কাজেই এখনকার মেয়েরা সেই হাওয়ায় উপদেবতাগ্রস্ত হইতেছে। চক্রবর্ত্তীমহাশয়, তাহাদিগকে 'সায়েস্তা' করিবার উদ্দেশে, এই 'ঠাকুরমা' গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থে ঠাকুরমার সঙ্গে নাতিনীর কথোপকথন। ঠাকুরমা বেশ সোজা সরল ভাষায় নাতিনীকে গৃহস্থালীর অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি শিখাইয়া দিতেছেন। ... এই সব বিষয়ের রচনা পড়িতে পড়িতে লিপিমাধুর্য্যে মনে হয়, যেন উপন্যাস। এ দুর্দ্দিনে এরূপ পুস্তকের প্রকাশে আনন্দ। এ গ্রন্থ সাদরে পাঠ্য।" (**সময়**)—পুস্তকখানি স্ত্রী-শিক্ষা-সম্বন্ধীয় জ্ঞানগর্ভ ও জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। শুধু শিক্ষাপ্রদ বলিয়াই যে, এ গ্রন্থের প্রশংসা করিতেছি, তাহা নহে। পুস্তকখানি সুলিখিতও বটে। বালিকা বিদ্যালয়ে বালিকাদিগের পাঠ্যরূপে এই পুস্তক নির্ব্বাচিত হইলে যে খুবই ভাল হয়, সে পক্ষে সন্দেহ নাই। বিলাস-ব্যাধি আমাদের শুদ্ধান্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। এ অবস্থায় এরূপ গ্রন্থ গৃহে গৃহে বালিকাদের পাঠ করান কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থ পড়িয়া ইহার উপদেশ অনুসারে

চলিতে পারিলে, গৃহস্থ-সংসারে স্বাস্থ্য অনেকটা ফিরিতে পারে, সংসার অনেক অসুবিধার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে * ।”

(**কাজের লোক**)—‘একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দু-স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক বালিকা বয়স হইতে প্রস্তা অবস্থা পর্যান্ত স্ত্রীলোকের যাহা কিছু সাংসারিক বিষয় জানা আবশ্যক ঠাকুরমার উপদেশে তাহার কোনটাই বাদ পড়ে নাই। ঠাকুরমা” আমাদের আধুনিক মহিলাগণের পারিচালিকাস্বরূপ হইলে সংসারে যে শান্তি বিরাজ করিতে পারিবে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।*** ঠাকুরমা’ অত্যাবশ্যকী। উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীপাঠ্য মধ্যে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।’

(“THE TELEGRAPH”)—“ * * highly recommend this book * * * for a text book in all Hindu Girls' Schools in the Province.” (“THE INDIAN STUDENT”) —“ * * * It is very useful and instructive to the females for whom it is specially intended.”

প্রসিদ্ধ সাধন ও যোগ বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীমৎ পরমহংস

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত

সাধন বিষয়ক অপূর্ব্ব গ্রন্থাবলী।

যথার্থ চতুর্ব্বিধ যোগ তত্ত্ব ও সাধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ সরস ও উপাদেয় পুস্তকাবলী ইতঃপূর্ব্বে আর কোন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয় নাই। সাধনার দুজ্ঞের্য় তত্ত্বসমূহ যাহা তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট ভিন্ন জানিবার উপায় নাই, তাহারই গূঢ় আভাষ এই সমস্ত গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাধক-সমাজে উচ্চভাবে প্রশংসিত।

স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতীর গ্রন্থাবলী।

সাধনপ্রদীপ [সনাতন সাধন-তত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য (১ম খণ্ড)]। (তৃতীয় সংস্করণ)—

আমূল সংশোধিত ও নব নব বিষয়সংযোগে বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত। স্বর্ণাক্ষর-লিখিত সুন্দর বিলাতিবং বাধান ও শ্রীশ্রীদক্ষিণকালিকার সুরঞ্জিত সুন্দর চিত্রসহ, মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

সাধনপ্রদীপ-সম্বন্ধে অভিমত—

(**'এডুকেশন গেজেট'**)—"এই পরম উপাদেয় পুস্তকখানি ঠিক সময়েই মহামায়ার কৃপায় বঙ্গভূমিতে প্রচারিত হইল, ইহা পাঠে কলির বেদ আগম-শাস্ত্র-সম্বন্ধে ভ্রম-ধারণা সকল দূর হইবে এবং বাঙ্গলায় পুনরায় 'স্মরহর সমান ক্ষিতিতলে' বীরপুরুষদিগের আবির্ভাবের পথ মুক্ত হইবে। ***এই পুস্তকের কথাগুলি***সযত্নে পাঠ করা উচিত***।"

(**'হিতবাদী'**)—"গ্রন্থপ্রণেতা দুরবগাহ তন্ত্রসাগরের পরিচয় রাখেন, তন্ত্রের এমন ব্যাখ্যা-পুস্তকের যথেষ্ট প্রচার হওয়া ভাল।"

("THE TELEGRAPH")—'It is a treatise on the fundamental principles of Hindu religion * * * The manner in which the book has been dealt with by the author is highly commendable. He is a profound thinker and an expounder of the difficult and intricate problems of religion. We gladly admit that it is a happy production of its kind and we recommend it to every member of the Hindu household. * * *

('সমন্বয়')—"জটিল ও নীরস বিষয়সকলও সরল ও সরস করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা স্বামীজির যথেষ্ট পরিমাণে আছে। যুক্তি তর্কের সমাবেশ ও লিখনপ্রণালীর গুণে সত্য সত্যই পুস্তকখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ('মেদিনীপুর হিতৈষী')—গ্রন্থখানি সাধকের লিখিত—সাধনার সামগ্রী, ভক্তির অভিব্যক্তি। যাহারা তন্ত্রকে ঘৃণা করেন, আধুনিক বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহারা একবার পাঠ করুন একবার তন্ত্র কি? তাহা বুঝিবার চেষ্টা করুন—আত্মহারা হইবেন দিব্যজ্ঞান লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবেন।"

('ব্রহ্মবিদ্যা')—"* * * এই গ্রন্থে তন্ত্রের সেই মৌলিক মহান উদারতার বিষয় আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত জনগণেরও উপযোগীরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থকার সিদ্ধ-সাধক, নতুবা এরূপ সহজে বোধগম্যভাবে তন্ত্রতত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার শক্তি অপরের হইতে পারে না। পুস্তকখানি সকলকেই একবার পড়িতে অনুরোধ করি।"

পূজ্যপাদ উক্ত স্বামীজী মহারাজের প্রণীত নিম্নলিখিত অন্যান্য পুস্তকগুলির সমালোচনা স্থানাভাবে আর প্রদত্ত হইল না।

গুরুপ্রদীপ ['সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য' ২য় খণ্ড] দ্বিতীয়সংস্করণ—সংশোধিত ও সম্বর্দ্ধিত। ইহাতে দীক্ষা-অভিষেক এবং যোগাদি সাধনার বিধান ও গূঢ় রহস্যসমূহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রী৺তারাদেবীর সুরঞ্জিত চিত্রসহ সুন্দর বাঁধাই মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

জ্ঞানপ্রদীপ (১ম ভাগ) ['সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র রহস্য' ৩য় খণ্ড)। পঞ্চদেবতার ত্রিবর্ণ-চিত্রসহ সুন্দর বাধাই মূল্য ৷৷০ পাঁচসিকা মাত্র। সনাতনধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যা', 'যোগসমাধান' 'মন্ত্রযোগ', 'হঠযোগ', 'লয়যোগ', 'রাজযোগ', 'পূর্ণদীক্ষাদি' ও 'বৈরাগ্য' সম্বন্ধে এরূপ সরল ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা এ পর্য্যন্ত কোন পুস্তকেই প্রকাশ হয় নাই। "তত্ত্বাভিলাষী মুমুক্ষু সজ্জনগণ গ্রন্থস্থিত উপদেশরূপ স্থির প্রদীপালোকে আত্মদর্শন করিতে সক্ষম হইবেন।"

জ্ঞানপ্রদীপ (২য় ভাগ)—['সনাতন-সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র রহস্য,' (৫ম খণ্ড)। ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রণব চিত্রসহ সুন্দর বাধাই মূল্য ৷৷০ পাঁচসিকা মাত্র। 'বিরজা-সংস্কার ও অন্তিম দীক্ষা,' 'সন্ন্যাসাশ্রম,' 'সন্ন্যাসীর ভেদ,' 'মঠাম্নায়-রহস্য,' 'দর্শন-সমন্বয়,' 'সৃষ্টি-রহস্য,' 'আত্মতত্ত্বাদি রহস্য' 'মহাবাক্য' ও 'মুক্তিতত্ত্ব-রহস্যাদি' সহ জ্ঞান ও মুক্তির উপায় সম্বন্ধে অতি সরলভাবে লিখিত অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

সন্ধ্যারহস্য বা সন্ধ্যাপ্রদীপ ইহা প্রত্যেক দ্বিজ-সন্তানেরই অবশ্য পাঠ্য অপূর্ব্ব গ্রন্থ। মূল্য ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

গীতাপ্রদীপ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য ৫ম খণ্ড)] ইহাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার লৌকিক, যৌগিক ও সমাধি-ভাষার অনুকূল কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানপূর্ণ অপূর্ব্ব সাধনতত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী প্রত্যেক গীতাধ্যায়ীর ইহা অবশ্যপাঠ্য।

'কৃষ্ণার্জ্জুনের বিচিত্র ত্রিবর্ণচিত্র ও যোগরহস্যের' চিত্রাবলীসহ সম্পূর্ণ নূতন ধরণে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুন্দর বাধাই মূল্য ।৵০ বার আনা।

যোগবিজ্ঞান সহ উপাসনা ক্রম বা পূজাপ্রদীপ [সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্ররহস্য (৬ষ্ঠ খণ্ড)] 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে উচ্চ প্রশংসিত। যোগ ও সাধন-বিজ্ঞানপূর্ণ এমন উপাদেয় উপাসনা-গ্রন্থ কস্মিনকালেও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা সিদ্ধ-গুরুমণ্ডলীর অমূল্যদান। সনাতন-ধর্ম্মের এ হেন দুর্দ্দিনে এই অসাধারণ গ্রন্থের প্রকাশ কেবল শ্রীশ্রীইষ্টগুরুর অপার করুণার নিদর্শনমাত্র। ইহার বর্ণনা ভাষায় চলে না, প্রকৃত সাধনাভিলাষী ভক্ত জনের কেবল অন্তরের আনন্দ ও অনুভূতির বিষয়। 'ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের প্রথম-কৃত্য' হইতে 'অহোরাত্রির নিত্য-কর্ম্ম' ও নৈমিত্তিকাদি আজীবন-সাধনার অতীব গূঢ়যোগরহস্যপূর্ণ প্রকৃত অনুষ্ঠান ও উপদেশসমূহ' সহজবোধ্য-ভাষায় কথিত হইয়াছে। ইহা সাধকমাত্রেরই অপরিত্যাজ্য নিত্য-ধন, চিরজীবনের সঙ্গের সাথী ইহাতে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার স্বামিজীমহারাজের কৃপাদেশক্রমে যথাযথবর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র ও বিশুদ্ধ 'ষট্‌চক্র চিত্র', 'ষট্‌চক্রের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতাদিগের চিত্র', 'কামিনীদেবীর সুরঞ্জিত অদ্ভুত চিত্র' 'আসন-মণ্ডল', 'গুরুপাদুকা', বিবিধপ্রকার 'করমুদ্রা' 'সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল', নানা দেবদেবীর 'মন্ত্র' হোমকুণ্ডাবলী', 'স্থণ্ডিল-যন্ত্র', 'ত্রিশূলদণ্ড', 'শব্দব্রহ্ম'. 'গুরুমূর্ত্তি' ও 'আত্মলহরীর' বিপুল চিত্রাবলীর অদ্ভুত সমাবেশ হইয়াছে। প্রায় সাড়ে চারিশত পৃষ্ঠারও অধিক বিরাট অদ্বৈত-গ্রন্থ। মূল্য সুন্দর বাধাই ২।০ নয়সিকা মাত্র।